হানাবাড়ির রহস্য

শাহরিয়ার কবির

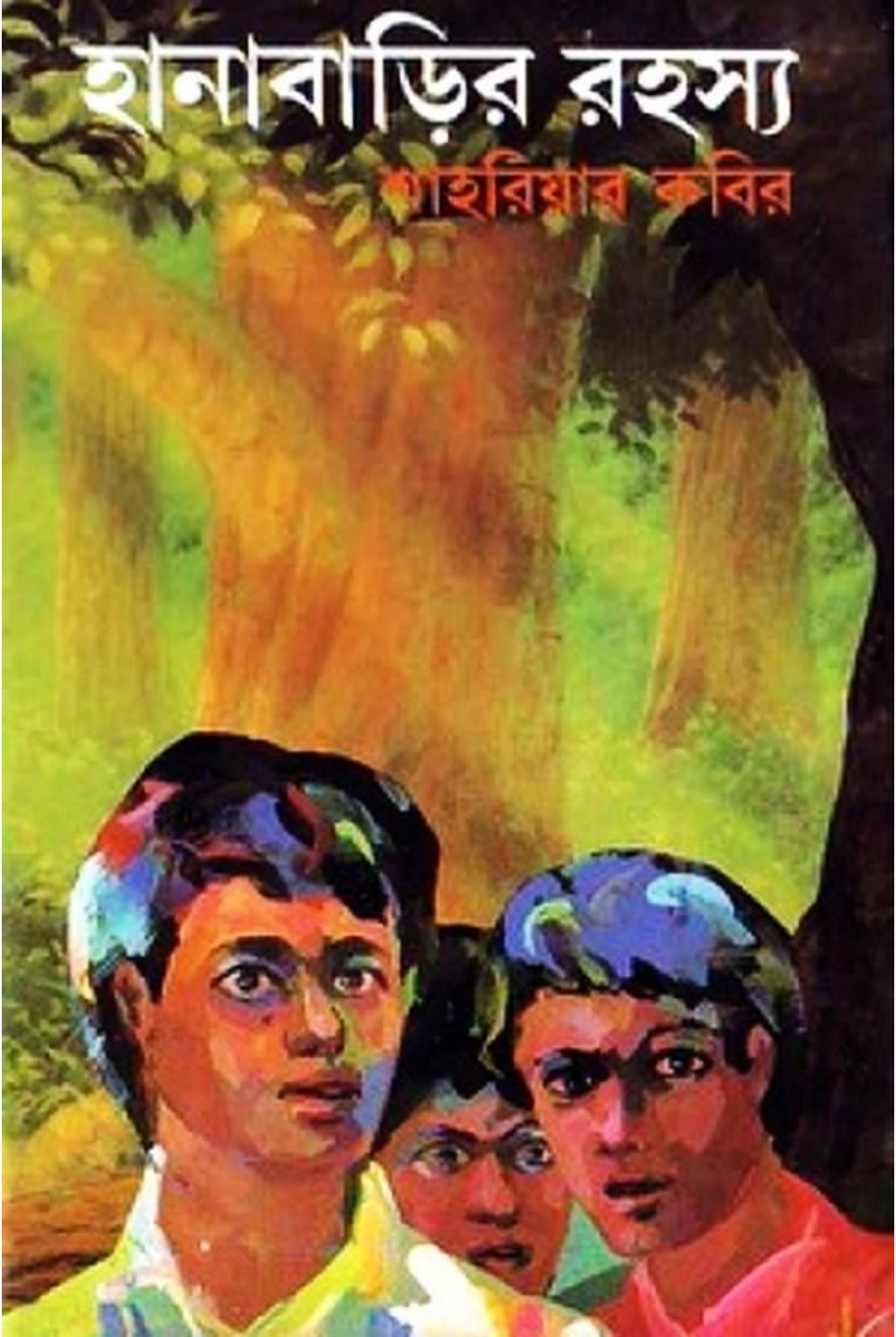

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan ও Banglapdf.net এর সৌজন্যে ।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

Website : Banglapdf.net

হানাবাড়ীর রহস্য

রাতুল
রবি
নবু

অলংকরণ : আফজাল হোসেন

নতুন বইয়ের লিস্টি দেয়া হয় নি বলে

বড়দিনের লম্বা ছুটির পর নতুন বছরে স্কুলের নতুন ক্লাসে ঢোকার আনন্দই আলাদা। অন্য স্কুল থেকে বদলি হয়ে দু'একজন নতুন ছেলে আসে। নতুন টিচাররা আসেন। নতুন বইয়ের লিস্টি না দেয়া পর্যন্ত শুধু গল্প করেই শেষ হয় ক্লাসের পিরিয়ডগুলো।

রাতুলরা সেবার নাইনে উঠে বাংলা সেকেণ্ড পেপারের ক্লাসে পেলো শুভদারঞ্জন স্যারকে। সেভেন—এইটে থাকতে ওরা দু'বার কি তিনবার পেয়েছিলো এই স্যারকে। অন্য কোনা স্যার না আসাতে তিনি ওদের দু'তিনটে ক্লাস নিয়েছিলেন। ওতেই ওরা মেতে গিয়েছিলো। কি দারুণ সব ভূতের গল্প আর অলৌকিক, রোমহর্ষক কাহিনী জানেন শুভদারঞ্জন স্যার! আর বলেনও এমনভাবে—বিশ্বাস না করে পারা যায় না।

'আত্মা অবিনশ্বর।' এই বলে গল্প শুরু করতেন তিনি। গোল রোলগোল্ডের চশমার ভেতর দিয়ে গোল গোল চোখ দুটো সবার মুখের ওপর বুলিয়ে দেখতেন কথাটা সবাই বুঝতে পেরেছে কিনা। তারপর একটু সহজ করে বলতেন, 'মানুষের দেহের মৃত্যু হয়, আত্মার মৃত্যু নেই।' এরপর গলাটা এক ধাপ নামিয়ে বলতেন, 'আমাদের চারপাশে লক্ষ কোটি আত্মা মুক্তির আশায় ছটফট করে ঘুরছেন। এঁদের কারো বয়স হাজারের কোঠা পেরিয়ে গেছে। মুক্তি না পেয়ে সারাক্ষণ দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। কখনো মুক্তির আশায় কারো শরীরে ভর করছেন।' তারপর নিজেই চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন, 'কে জানে হয়তো এখানেও কোনো অতৃপ্ত আত্মা ঘুরছেন। আমাদের চিত্ত অস্থির, অপবিত্র, তাই ওঁদের দেখি না।' এটুকু বলে জোড় হাতে অদৃশ্য আত্মার উদ্দেশে প্রণাম জানাতেন— 'যাঁরা মহাপুরুষ, যাঁদের চিত্ত পবিত্র, তাঁরা সব ঠিকই দেখেন।'

গন্ধীবাবা আর মছলীবাবা নামের সিদ্ধপুরুষদের নানারকম অলৌকিক ক্ষমতার কথাও বলতেন শুভদারঞ্জন স্যার। আরও বলতেন কালীনাথ তান্ত্রিক, সিধু ফাঁসুড়ে আর তারাময়ী ব্রহ্মচারিণীর অদ্ভুত, বিচিত্র সব গল্প।

পীর-ফকিরে বিশ্বাস রহমতুল্লা স্যারেরও কম ছিলো না। 'তোমরা তো দাদাজী কেবলার কথা শোন নাই।' শুদ্ধ বাংলা বলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও তিনি বলতে পারতেন না। তবে তার জন্য গল্পের রোমাঞ্চে কোনো ঘাটতি ছিলো না। 'দাদাজী কেবলার নফর আছিলো দুইটা জ্বীন। দাদাজীরে খুব ডরাইতো। জ্বীনগো আল্লাপাকে আগুন দিয়া বানাইছে। তেনাগো শরীর ভরা রাগ, মগার দাদাজীরে জ্বীনেরা খুব মানতো। আমি দেখছি ওনাগোরে। অজগর সাপের সুরত ধইরা শুইয়া আছিলেন আব্বা হুজুরের মাজারে। একবার এক নালায়েক খাদেম বিনা ওজুতে খানকা শরিফে আসছিলো। দুই জ্বীনের তখন গোস্বা হইছিলো খুব। দাদাজী বুঝাইয়া অগোরে ঠাণ্ডা করেন।' এরপর খাবিস জ্বীন কি করে বশ করতে হয় সেসব বলতেন রহমতুল্লা স্যার। ছিলেন ড্রইং-এর টিচার। হাতের লেখা মুক্তোদানার মতো জ্বলজ্বল করতো।

স্কাউট টিচার নিকোলাস স্যার ক্লাস এইটে ভুগোল পড়াবেন শুনে রাতুলরা আহ্লাদে আটখানা হলো। ক্লাসে যখন পড়ানোর কিছু থাকে না, তিনি বিদেশ ঘোরার গল্প বলেন। স্কাউটিং করার সুবাদে বহু দেশ ঘুরেছেন তিনি। ইন্দোনেশিয়ার কোন দ্বীপে একবার মানুষখেকো মানুষের পাল্লায় পড়ে কিভাবে বেঁচে এসেছিলেন সে গল্প তিনি যতোবার শোনান ততোবারই রোমাঞ্চ হয় ক্ষুদে শ্রোতাদের। রেঙ্গুনের এক বুড়িকে মা ডেকে কুক্‌রির কোপ খেতে খেতে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছিলেন—সে গল্পও কখনো পুরোনো হয় না। কোরিয়াতে দুই অমায়িক বুড়ো তাঁকে লাউডগা সাপের সুপ না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বেন না। শেষে অক্টোপাসের ঝোল খেয়ে ওদের অভিমান ভাঙাতে হয়েছিলো। অক্টোপাস আর জেলি ফিশ খেতে নাকি রবারের মতো, মোটেই উপাদেয় নয়—একথা তিনি ছেলেদের এমনভাবে বুঝিয়েছেন, জীবনে কেউ এ দু'টি প্রাণী খাওয়ার কথা মুখে আনবে না।

প্রথম দিকে নিরানন্দের মনে হয়েছিলো কামেলালি স্যারের ক্লাস। ব্ল্যাকবোর্ডে হাতের লেখা লিখতে দিয়ে টেবিলে পা তুলে ঝিমুতেন তিনি। দু'দিন না যেতেই ছেলেরা আবিষ্কার করে ফেললো, এই ক্লাসে পরম নিশ্চিন্তে কাটাকুটি খেলা যায়, স্যারের কার্টুন আঁকা যায়, নিচু গলায় গল্প করা যায়, ইচ্ছে করলে প্রহেলিকা বা রোমাঞ্চলহরী সিরিজের গল্পের বইও পড়া যায়; কেউ বারণ করবে না। বলা বাহুল্য কামেলালি স্যারের ক্লাসটিও রাতুলদের জন্য ভারি সুখের ছিলো।

এ কথা তো সবাই জানে বেশিদিন একটানা সুখের ভেতর কাটালে সুখও একঘেয়ে মনে হয়। গল্প শুনে আর গল্প করে যখন ক্লাস শেষ হতো, শীতের বিকেলে নরোম রোদে রবির সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরার সময় রাতুলের আর বলার কিছু থাকতো না। ছোড়দির দেবর রবি গত বছর বরিশাল থেকে এসে ওদের ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। নেহাত বৃত্তি পেতো বলেই ভর্তি হতে পেরেছিলো,

নইলে রাতুলদের মিশনারি স্কুল মফস্বল থেকে কেউ এসে পড়ার সুযোগ পাবে এমন কথা কেউ বলতে পারে না। প্রথম দিকে রবি খুব উত্তেজিত ছিলো। পরে রাতুলদের কাছে যখন সব কিছু একঘেয়ে মনে হতে লাগলো, রবিও ভাবলো নিকোলাস স্যারের মতো বিদেশে ঘুরতে না পারলে জীবনের কোনো দামই নেই। অনেক সময় মনে হতো সত্যিই কি তিনি এতো সব দেশ ঘুরেছেন? রাতুল অবশ্য বলেছে নিকোলাস স্যার ভ্রমণকাহিনী লিখলে আট-দশটা মোটা মোটা বই লিখতে পারবেন। ওর কথারই বা বিশ্বাস কি! রাতুল নিজেও তো গপ্পো মারার সুযোগ পেলে ছাড়ে না।

স্কুল থেকে ফিরে কুমোরটুলির বাড়ির বিরাট ছাদের এক কোণে বসে ওরা দু'জন ভাবে, অ্যাডভেঞ্চার ছাড়া জীবন অসার। নিচে সেজদা ছোড়দারা বন্ধুদের নিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলে, ছাদের কোণ থেকেও ওদের হল্লা শোনা যায়। দূরে বাদামতলি ঘাট দেখা যায়, সূর্যটা নবাববাড়ির গম্বুজের আড়ালে চলে গেলে বরিশাল খুলনার স্টীমারের ডাক শোনা যায়। রাতুল বলে, 'কোথাও যদি যাই জাহাজেই যাবো।'

রবি বলে, 'আমিও জাহাজের কথা ভেবেছি।'

'তুই কখন ভাবলি? তোকে তো আমিই প্রথম ট্রেজার আইল্যাণ্ড আর সুইস ফ্যামিলি রবিনসন পড়তে দিয়েছি?'

'তুই জাহাজে চড়বি, সাঁতার জানিস? কোনা দিন তো লঞ্চেও চড়িস নি। শুধু বই পড়ে অ্যাডভেঞ্চার হয় না।'

'সবই যদি জানিস তবে একাই যা না!'

'আমি বুঝি তাই বলছি! তুই আমার চেয়ে বই অনেক বেশি পড়েছিস, এ কথা কি অস্বীকার করেছি?'

'তোদের গ্রামের বাড়িতে গেলে আমাকে সাঁতার শিখিয়ে দিস।'

'তোর আর যাওয়া হয়েছে! গরমের ছুটিতে কতো করে বললাম চল, তুই তো কানেই তুললি না।'

'তুই তো জানিস, ছোড়দিকে এখনো তোর মা যেতে বলেন নি।'

'বেনুদা মাকে না জানিয়ে তোর ছোড়দিকে বিয়ে করেছে বলেই না মা একটু চটেছিলেন। গরমের ছুটিতে গিয়ে দেখেছি, বউ দেখার জন্য মা ছটফট করছেন, আবার লজ্জায় বলতেও পারছেন না।'

'বেনুদা বুঝি সেজন্যে বাড়ি গেছে?'

'তবে আর বলছি কি! মা'র রাগ পড়ে গেছে। বেনুদা ফিরে এসে ভাবীকে নিয়ে যাবে।'

রাতুলদের বাড়িতে ওর বাবা, কাকা, জ্যাঠা, তাদের ছেলেমেয়ে আর আত্মীয়স্বজন মিলে বিরাট সংসার। দুঃখের বিষয় হলো, রবি আসার আগে

রাতুলের কাছাকাছি বয়সের একজনও ছিলো না। ছোড়দি যদি এতো নাটক করে বেনুদাকে বিয়ে না করতো, রবির সঙ্গেও এ জন্মে দেখা হতো না।

ছোড়দির বিয়ে নিয়ে সে এক দারুণ কাণ্ড! বেনুদা ছিলো সেজদার বন্ধু, মাত্র ডাক্তারি পাস করেছে। বাড়ির ছেলের মতোই আসা-যাওয়া করে, তাস খেলে, ব্যাডমিন্টন খেলে, ছোড়দি-মেজদিদের নিয়ে সিনেমায় যায়। কেউ জানতেও পারে নি কোন ফাঁকে বেনুদার সঙ্গে ছোড়দির এতো জানাশোনা হলো। তবে রাতুলের কথা আলাদা।

গত শীতে একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে রাতুল দেখে সারাবাড়ি থমথম করছে। দু'একজনকে জিজ্ঞেস করলো—কি হয়েছে? কেউ কিছু বলে না। রাঙা নানী রাতুলদের দুঃখিনী রাজকন্যার আর ঘুঁটে কুড়োনির গল্প বলতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করতেই চাপা গলায় রাগে ফেটে পড়লেন—'হবে আবার কি? যা হবার নয় তাই হয়েছে। তোমাদের ছোড়দি ডাক্তার ছোঁড়াকে বিয়ে করবে বলে বায়না ধরেছে। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা, আমি কোনোদিন এমন কথা মুখ ফুটে বলতে পারতাম!'

সেজদা কোথায় যেন যাচ্ছিলো। রাঙা নানীর শেষের কথা শুনে গম্ভীর হয়ে বললো, 'তোমার কি আর বিয়ের বয়স আছে যে এসব কথা তোমাকে বলতে হবে! বয়স থাকলে ঠিকই বলতে।'

রাঙা নানী বললেন, 'চোরের মা'র দেখি বড় গলা! ওই ছোঁড়াকে তুই-ই এনেছিস এ বাড়িতে। হাবুকে বলবো যাবার আগে তোকে সায়েস্তা করতে।'

'এনেছিলাম বলেই না অতো ভালো জামাই পেলে।' এই বলে সেজদা চলে গেলো।

রাতুল জানতো এরকম কিছু একটা ঘটবে। ছোড়দি নিজের পছন্দের কথা নিজে বলাতে বড়দের সবার মুখ ভার। তবে সেজদা-মেজদা কাউকে বুঝিয়ে, কাউকে ভয় দেখিয়ে, রাজি করিয়েছে।

রাগ বেনুদার মা'রও কম নয়। শরীর ভালো নয় বলে বিয়েতে এলেন না। বেনুদার বাবা নেই। থাকে হোস্টেলে। বরিশাল থেকে কাকারা এসে বিয়ে দিলেন।

বিয়ের পর বেনুদা যখন বাড়ি ভাড়া করে ছোড়দিকে নিয়ে যাবে বললো, বড়দের তখন সে কি রাগ! বলা হলো—'আগে পশার-টসার জমুক, তারপর দেখা যাবে।' ঠিক হলো ছোড়দির পরীক্ষা পর্যন্ত বেনুদাকে এ বাড়িতে থাকতে হবে। বেনুদা তবু গাঁইগুঁই করলো। ছোট ভাইর নাকি গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা হচ্ছে না। ওকে আনতে হবে। আলাদা বাসা না করলেই নয়। শুনে রাঙা নানী ধমক লাগালেন—'এমনিতে বাপু ঢের অপকম্মো করেছো। মুরুব্বিদের কথা মান্য করতে শেখো। তোমার ভাই এমন কোন নবাবের নাতি যে, ওর জন্যে আলাদা

বাসা লাগবে? ও আমাদের রাতুলের সঙ্গে থাকবে। এ বাড়িতে রাতুল ছোঁড়ার সঙ্গী কেউ নেই। একসঙ্গে পড়াশোনা করবে। ওরও উপকার হবে।'

রাঙা নানীর কথা কেউ অমান্য করে না। বেনুদা আপত্তি করলেও রবিকে আসতে হলো। রাতুলও ভারি খুশি। দু'দিনেই ওরা দু'জন বুঝে ফেললো, ওদের মতো বন্ধু পৃথিবীতে দুটো নেই। আর এ বাড়িতে ওরা অন্য সবার চেয়ে আলাদা।

রোজকার মতো সেদিন সন্ধে অব্দি ছাদে বসে গল্প শেষ করে রাতুলরা নিচে নেমে শুনলো ছোড়দি নাকি শ্বশুরবাড়ি যাবে। বাবা অফিস থেকে ফিরে চা খেয়ে দোতলার ঘরে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে খবরের কাগজ দেখছেন—জেঠিমা এসে বললেন, 'বেনুর মা'র মান ভেঙেছে। চিঠি লিখেছেন তাঁর বউমাকে পাঠাতে। বেনু বরিশালে ওদের জন্যে অপেক্ষা করবে, রবি যেন নীনাকে নিয়ে যায়।'

বাবা মৃদু হেসে বললেন, 'ভালোই তো। কালই পাঠিয়ে দাও।'

জেঠিমা একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আমি বলি কি, রবির সঙ্গে রাতুলও যাক না। মেয়েটা প্রথমবার শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে।'

জেঠিমার কথা শুনে আনন্দ আর উত্তেজনায় রাতুলের বুক ঢিবঢিব করতে লাগলো। বরিশাল থেকে ষাট মাইল দুরে সমুদ্রের কাছে এক অজ পাড়াগাঁয়ে রবিদের বাড়ি। জীবনে লঞ্চে ওঠে নি রাতুল। এ সুযোগ স্টীমারেও ওঠা হবে। কি মজাই না হবে।

হঠাৎ বাবার কথা শুনে রাতুলের সব আনন্দ মুহূর্তের ভেতর কর্পূরের মতো উবে গেলো। বাবা জেঠিমাকে বললেন 'স্কুল খুলে গেছে। খামোকা দু'জনের পড়া নষ্ট করার কি দরকার। রবি একাই যাক। পরে রাতুলের কাছ থেকে ক্লাসের পড়া জেনে নেবে।'

ক্লাসে যে এখন পড়াশোনা কিছু হয় না, কথাটা বাবাকে জানানো দরকার। রাতুল ঘরে ঢুকে এটা-সেটা নাড়তে লাগলো। বাবা বললেন, 'এখানে ঘুরঘুর করছিস কেন, পড়ালেখা নেই?'

'লুডুঘর খুঁজছি,' বলে রাতুল মিছেমিছি তাকের ওপর খুঁজতে লাগলো।

'পড়ার সময় লুডুঘর কেন?'

যে কথা বলার জন্যে রাতুল ঘরে ঢুকেছিলো, টপ করে বলে ফেললো, 'বুকলিস্টের পাত্তাই নেই! কবে দেয় তারও ঠিক নেই।'

'তাহলে আর অসুবিধে কি।' জেঠিমা বললেন বাবাকে— 'বইয়ের লিস্টি দিলেও পড়া শুরু হতে আরও আট-দশদিন, ওরা খুব বেশি হলে দিন পনেরো থাকবে।'

রাতুল ভালোমানুষের মতো— যেন কিছুই জানে না, জেঠিমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাবো জেঠিমা?'

জেঠিমা বাবাকে পানের খিলি সাজিয়ে দিয়ে, নিজে একটা মুখে পুরে চিবুতে

চিবুতে বললেন 'তোদের ছোড়দি বরিশাল যাবে। রবি নিয়ে যাবে। সঙ্গে তুইও যাবি। কাল তোদের ইশকুলে গিয়ে কাজ নেই। সব গোছগাছ করতে হবে। রবিকে বলে ধোপাবাড়ির কাপড়গুলো আলাদা করে রাখিস।'

রাজবাড়ি বললেও আসলে হানাবাড়ি

'খুব পুরোনো বাড়ি?'

'তোকে আর বলছি কি! আসলে কতো পুরোনো মা'র দাদুও বলতে পারবে না। সবাই ওটাকে পুরেনো রাজবাড়ি বলে।'

স্টীমারের ডেকে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো রাতুল আর রবি। ভোর ছ'টায় স্টীমার ছেড়েছে বাদামতলি ঘাট থেকে। এখন এগারোটা বাজে। এর ভেতর একবারও ওরা কেবিনে যায় নি। ছোড়দি সেখানে একা বসে বেগম পত্রিকা পড়ছে। দু'বার উঠে এসে ওদের ডেকেছিলো ভেতরে যাওয়ার জন্যে। রাতুল যায় নি, রবিকেও যেতে দেয় নি। ছোড়দি বলেছে বাড়ি ফিরে নাকি জেঠিমাকে বলে মার খাওয়াবে। অমন অনেক কথাই ছোড়দি বলে। মার খাওয়ানো অতো সোজা নয়। তখন বেনুদা থাকবে। বিয়ের আগে লুকিয়ে বেনুদার চিঠি এনে ছোড়দিকে দিতো বলে, ওকে একটু বেশি আদর করে বেনুদা। যেমন ছোড়দি বেশি আদর করে রবিকে।

নিজেদের বাড়ির গল্প বলতে গিয়ে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলো রবি। রাতুলকে এসব কথা আগে কখনো বলে নি। ভেবেছে, রাতুল যদি ওকে অহংকারী ভাবে! আড়চোখে একবার রবির দিকে তাকিয়ে রাতুল বুঝলো, আরো কথা বলার জন্য ও মুখিয়ে আছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে সন্দেহের গলায় বললো, 'তাহলে তুই বলতে চাস তোরা আগে রাজা ছিলি!'

রবি একটু অপ্রস্তুত হলো—'ঠিক রাজা নয়, আমাদের পূর্বপুরুষরা বড় জমিদার ছিলো। ওই তল্লাটে অতো বড় বাড়ি কোথাও ছিলো না বলে সবাই ওটাকে রাজবাড়ি বলতো। এখন অবশ্য কিছুই অবশিষ্ট নেই। ছোটবেলায় সদর দরজার পাশে দুটো শ্বেতপাথরের সিংহ দেখেছিলাম। সেগুলো পর্যন্ত চুরি হয়ে

গেছে। অবশ্য যে চুরি করেছে সে তার ফলও ভোগ করেছে।'

'গ্রামে আমাদের বাড়ির মতো গোটা এলাকায় দ্বিতীয়টা ছিলো না।' জাঁক করে বললো রাতুল।

'তোরা কখনো যাস না কেন সেখনে?'

'বা-রে, সে তো কবে নদীর ভাঙনে শেষ হয়ে গেছে।'

'গুল মারিস না।'

'বয়ে গেছে তোর সঙ্গে গুল মারতে। গুল তো তুই মারছিস।'

'তাহলে কথা বলতে আসিস কেন?'

'বয়ে গেছে তোর সঙ্গে কথা বলতে।' এই বলে রাতুল ব্যাগ থেকে সুপারম্যানের কমিক বের করে ডেক চেয়ারে বসে পড়তে লাগলো। রবি মুখ ভার করে কেবিনে চলে গেলো।

বরিশাল এসে রাতুলদের ঝকঝকে স্টীমার বদলে নড়বড়ে একটা পুরোনো লঞ্চে উঠতে হলো। বেনুদা ওদের নেয়ার জন্য বরিশাল পর্যন্ত এসেছে। রাতুল আসবে আগে জানানো হয় নি। বেনুদা ওকে দেখে এমন হৈচৈ করলো, যেন এক মস্ত লাটসায়েব এসেছেন। রাতুল আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো, ব্যাপারটা রবি মোটেই সুনজরে দেখছে না। বেনুদা সারাক্ষণ ওকে—'কি খাবে', 'পথে কষ্ট হয়নি তো', 'আরাম করে বসছো না কেন'—এমনিতরো হাজারটা কথা বলে রবিকে আরো চটিয়ে দিলো। শেষে ছোড়দিই বেনুদাকে বললো, 'ওকে অতো আহ্লাদ দিয়ে মাথায় তুলো না।'

রাতুল তখন রবিকে বললো, 'চল, আমরা নদী দেখি।'

ছোড়দির কথা শুনেই রবির রাগ পড়ে গিয়েছিলো। তাই রাতুলের সঙ্গে সুবোধ বালকের মতো কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো। ছাদের ওপর কারা যেন চালের বস্তা রেখেছে। ওর ওপর দু'জন পাশাপাশি বসলো। রাতুল ভাব জমাবার জন্যে বললো, 'তুই কি আমার ওপর রাগ করেছিস?'

রবি বললো, 'তুই তখন বললি কেন আমার সাথে কথা বলতে তোর বয়ে গেছে?'

'বা-রে, তুই যে বললি, আমি গুল মারছি?'

'তুইও তো বলেছিস।'

রাতুল এবার হেসে ফেললো,—'থাক, আর ঝগড়া করতে হবে না। তোদের পুরোনো বাড়ির কথা আরো বল।'

'জানিস, আমাদের পুরোনো বাড়িতে অনেক গুপ্তধন আছে!' বাড়ির কথা বলতে গিয়ে রবির সব রাগ কর্পূরের মতো উবে গেলো।

রাতুল বললো, 'তুই কি করে জানলি?'

'বাবার দাদু বলেছে কোম্পানির আমলে নাকি আমাদের পূর্বপুরুষরা ডাকাত

ছিলো। ওরা টাকা-পয়সা সোনা-দানা সব কলসিতে ভরে মাটির নিচে পুঁতে রাখতো।'

'তোরা তুলে নিলেই পারিস।'

'তুই কিছুই জানিস না। ও বাড়ির তিন পাশে পুরোনো গোরস্থান। এক পাশে নদী। নদীর ওপারে সুন্দরবন। বাড়ির চারপাশে কতো যে সাপ রয়েছে তার হিসেব নেই। লোকে বলে, ওখানকার সব সাপ নাকি আসলে সাপ নয়, জ্বীন। জ্বীনরা গুপ্তধন পাহারা দেয়।'

'জ্বীনদের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, বসে বসে তোদের গুপ্তধন পাহারা দেবে। সুন্দরবনের কথা যে বলছিস, তাহলে বল বাঘও আছে।'

'আছেই তো। আমাদের গাঁয়ের দু'জন বাওয়ালী বাঘের পেটে গেছে। বাড়িতে গেলে দেখবি এখনো পাঁচখানা বাঘের চামড়া আছে।'

'বাঘের চামড়া কিনতেও পাওয়া যায়।'

'গাঁয়ের লোকদের জিজ্ঞেস করিস আমার দাদা ক'টা বাঘ মেরেছিলো। কেনা চামড়া তোদের বাড়িতে থাকতে পারে, আমাদের সব শিকারের চামড়া। বেনুদা বুঝি বলে নি?'

রবির গলায় রাগের আভাস দেখে রাতুল প্রসঙ্গ পাল্টালো—'ঠিক আছে, তোদের বাড়িতে গিয়ে বাঘের ডাক শুনে ঘুমোবো। এখন গুপ্তধনের কথা বল।'

মুখে যতোই বলুক—গুপ্তধনের কথা শুনে রাতুলের ভীষণ রোমাঞ্চ হলো। কারই-বা না হয়! বইয়ে গুপ্তধনের কথা অনেক পড়েছে রাতুল, তাই বলে সত্যিকারের গুপ্তধন—ভাবতেই গা শিরশির করছিলো। আগেকার দিনে পুরোনো ভাঙা জমিদারবাড়িতে অনেকে কলসি-ভরা মোহর পেয়েছে, একথা রাতুল দিদার মুখে শুনেছে। দিদা বলেন, কতো লোক নাকি এই মোহর পেয়ে জমিদারি কিনেছে। এক ঘড়ায় পাঁচশ' মোহর থাকে। তবে জেঠু একদিন শুনতে পেয়ে দিদাকে বলেছিলেন, 'মোহরের টাকা দিয়ে কেউ জমিদারি কেনে নি। কিনেছে ডাকাতির টাকায়।' শুনে দিদার সে কি রাগ—'আমার নানারা বুঝি ডাকাত ছিলো? বড় নানা যে দু'ঘড়া মোহর পেয়েছিলেন, সেটা বুঝি মিছে কথা? জেঠু, অম্লান বদনে বললেন, 'কে দেখতে গেছে ওসব মাটি খুঁড়ে পেয়েছে, না ডাকাতি করে পেয়েছে।' এ কথা শুনে দিদার রাগ আরো বেড়ে গেলো—'বড়দের কথার মাঝখানে কথা বলতে আসিস না হাবু।' এই বলে তিনি রাঙা নানীর সঙ্গে মোহর বড় না আশরাফি বড়, এ নিয়ে তর্ক জুড়ে দিলেন।

রাতুল রবির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো, গম্ভীর হয়ে ও আকাশ দেখছে। বোঝা গেলো ওর কথা বিশ্বাস করে নি বলে আবার রাগ হয়েছে। রাতুল আসলে রবির কথা অবিশ্বাস করে নি। ওর পূর্বপুরুষেরা জমিদার ছিলো, তার আগে ছিলো ডাকাত; ওদের পুরোনো বাড়িতে গুপ্তধন না থাকার কোন কারণই নেই।

রবিকে বললো, 'মনে কর আমরা তোদের পুরোনো বাড়িতে এক কলসি মোহর পেলাম। কেমন হবে বল তো?'

'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?' রবি চোখ দুটো মোহরের মতো গোল করে বললো, 'ভয়ে এখনো রাজবাড়ির ধারে-কাছে খুনে ডাকাত পর্যন্ত যায় না, আর তুই যাবি মোহর আনতে? মাঝে মাঝে তুই এমন উল্টোপাল্টা কথা বলিস, শুনলেই ভয় করে।'

'অমন করে তাকাস না রবি। চোখের মণি দুটো ঠিকরে বেরিয়ে যাবে।'

রবি গম্ভীর হলে বললো, 'এসব কথা আমাদের বাড়িতে গিয়ে কাউকে বলিস না। পুরোনো বাড়ির জ্বীনরা বিরক্ত হয়—এমন কাজ কেউ কখনো করে না।'

'কি করে বুঝলি, সাপগুলো যে জ্বীন?'

'বাবার দাদু, আমাদের বড়বাবা মস্তবড় কামেল ছিলেন। একবার দেখেছিলেন তিনি। সন্ধেবেলা গোরস্থানে কার কবর জেয়ারত করে ফেরার সময় শোনেন পুরোনো বাড়িতে কিসের যেন শব্দ হচ্ছে, অনেকটা দরুদ পড়ার মতো। কাছে গিয়ে দেখেন, অনেকগুলো সাপ কাতার বেঁধে নামাজ পড়ছে। বড়বাবাকে দেখে ওদের একজন মানুষের চেহারা ধরে বেরিয়ে এলো। বললো, হুজুর আপনি বুজুর্গ মানুষ। আপনার আব্বা হুজুরের কাছে আমরা কোরান শরীফ পড়েছি। আমরা আপনাদের খেদমতগার। মানুষের অত্যাচারে লোকালয়ে বসে আল্লার এবাদত করতে পারি না। তাই এই বিরান বাড়িতে এসে থাকছি। আপনার কাছে আমাদের আরজি, এখানে কোনো আদমের আওলাদ যেন আমাদের বিরক্ত না করে। শুনে বড়বাবা বললেন, ঠিক আছে, আমি বলে দেবো সবাইকে। তবে তোমাদেরও বলছি, তোমরা এ বাড়ি ছেড়ে লোকালয়ে এসো না। আমাদের ছেলেমেয়েরা সব সময় পাক-সাফ থাকে না। দেখলে তোমাদের রাগ হতে পারে। জ্বীন বললো, না হুজুর, আমরা এ বাড়ির বাইরে যাই না। জেনেশুনে কেউ আমাদের ক্ষতি না করলে আমরা কারো ক্ষতি করি না। এই বলে জ্বীনটা বড়বাবাকে সালাম দিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেলো।'

রবির কথা শুনে রাতুলের খাবি খাওয়ার দশা হলো—'বলিস কি! সত্যি সত্যি তোর বড়বাবা জ্বীনের সঙ্গে কথা বলেছিলো?'

রবি গম্ভীর হয়ে বললো, 'মুরুব্বিদের নিয়ে আমরা কখনো মিছে কথা বলি না। আমার বড়দাদুর কাছে দুটো জ্বীন এসে কোরান শরীফ পড়তো। সেজন্যে জ্বীনরা আমাদের বাড়ির কাউকে এখনো কিছু বলে নি।'

'তুই যে বললি ও বাড়ির জিনিসপত্র সব চোরে নিয়ে গেছে। জ্বীনের ভয় থাকলে চোর ঢোকে কি করে?

রবি কাষ্ঠ হেসে বললো, 'তোর মতো অবিশ্বাসী মানুষের তো অভাব নেই! চুরি যারা করেছে তারা ফলও ভোগ করেছে। শ্বেতপাথরের সিংহ দুটো

নিয়েছিলো সর্দার বাড়ির খুনে ছেলে ছানাউল্লা। দু'বার খুনের দায়ে জেল খেটেছে। ডরভয় বলতে কিছু ছিলো না। নিয়মিত শহরে যেতো, ভেবেছিলো শহরে নিয়ে বিক্রি করতে পারলে ভালো দাম পাবে। সঙ্গে এক চ্যালা নিয়ে সিংহ দুটো বস্তায় পুরে নৌকায় উঠেছে। শীতের সময়, ঝড়-তুফানের নাম-নিশানা নেই। নৌকা যখন মাঝনদীতে, হঠাৎ কোত্থেকে একটুকরো মেঘ এসে আকাশ অন্ধকার করে ফেললো। শুরু হলো ভীষণ ঝড়। ঘনঘন বাজ পড়তে লাগলো। একবার ভীষণ শব্দে একটা বাজ পড়লো নৌকার ওপর। মাঝি ছিটকে পড়লো নদীর ভেতর। সাঁতার কাটতে কাটতে মাঝি দেখলো, বস্তা ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়লো দুটো সাদা সিংহ। চোখের পলকে ভয়ঙ্কর এক ডাক ছেড়ে ছানাউল্লা আর তার চ্যালাকে মুখে তুলে নিয়ে শূন্যে লাফ দিলো। তারপর আর কিছু দেখে নি মাঝি। একটু পরেই দেখে ঝড় থেমে গেছে, আকাশের সব মেঘ বাতাসে উড়ে গেছে। বিকেলের শান্ত নদীতে নৌকা ভাসছে। মাঝি নৌকায় উঠে দেখলো, পাটতনের ওপর ছেঁড়া বস্তা দুটো পড়ে আছে, এখানে-সেখান রক্তের দাগ। দাদা তখন বেঁচে ছিলেন। মাঝি ফিরে এসে সোজা দাদার পায়ের উপর পড়লো হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললো, বস্তায় করে ওরা রাজবাড়ির সিংহ নিচ্ছে, ও জানতো না। ওরা তো পাপের ফল ভোগ করেছে, ওর যেন কিছু না হয়। দাদা বললেন, তোর কিছু হলে তখনই হতো। বাড়ি যা। যাবার পথে মাজারে ক'টা মোমবাতি দিয়ে যাস। এরপর অবশ্য পুরোনো বাড়ির কোনো জিনিস খোয়া গেছে বলে শুনি নি।

রবি যেভাবে কথাগুলো বলছিলো, রাতুল বিশ্বাস করে ফেলেছিলো। তবে বাড়িতে বড়দা মেজদা যেভাবে জ্বীন-ভূত নিয়ে হাসিঠাট্টা করে, শুনতে শুনতে এটাও ওর মনের ভেতর শেকড় গেড়ে বসেছিলো, পৃথিবীতে অলৌকিক বলে কিছু নেই। নিকোলাস স্যারও ক্লাসে বলেন, মানুষ যখন কোনো কিছুর ব্যাখ্যা করতে পারে না, যখন বলতে পারে না কেন এমন হলো, তখনই বলে অলৌকিক কোনো কারণে ঘটেছে। শুভদারঞ্জন স্যারের কথা তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। এ নিয়ে অবশ্য শুভদারঞ্জন স্যার সামনে কিছু না বললেও আড়ালে বলেন, 'নাস্তিক।' রহমতুল্লা স্যার বলেন, 'নাসারা।'

ছানাউল্লার সিংহ চুরির ঘটনা সত্যি হলেও ঝড়-তুফানের গল্পটা বানানোও হতে পারে। কে জানে দলে হয়তো মাঝিও ছিলো। বিক্রি করে লাভের বখরা নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছে, ছানাউল্লা আর তার চ্যালাকে মেরে নদীতে ফেলে দিয়েছে। মাঝি জানে রাজবাড়ির কর্তারা ওর সহায় থাকলে থানা-পুলিশ কিছু করতে পারবে না। তাই ঝড়-তুফানের গল্প ফেঁদে রবির দাদাকে পটিয়েছে।

রাতুল হঠাৎ বললো, 'আচ্ছা রবি, সেই মাঝিটা এখন কোথায় রে?'

'ওরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। যে বছর দাদা মারা গেলেন, সে বছরই চলে

গেলো। বললো, হুজুর নেই আমাকে কে বাঁচাবে? বাবা তো চাকরির সুবাদে বাইরে বাইরে থাকতেন।'

রাতুল আপন মনে বললো, 'মাঝি ঠিকই বলেছে। তোর দাদা ছাড়া ওকে আর কেউ বাঁচাতে পারতো না।'

রবি বললো, 'এতোক্ষণে আমার কথা বুঝি তোর বিশ্বাস হলো?'

রাতুল মৃদু হেসে কথা পাল্টালো—'তুই হানাবাড়ি বইটা পড়েছিস রবি?'

অবাক হয়ে রবি বললো, 'না, পড়ি নি। কেন, কার লেখা? কি আছে ওতে?'

'প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা হানাবাড়ি। আমার শেলফে আছে, পড়িস।' আপন মনে কথাগুলো বললো রাতুল— 'মনে হচ্ছে তোদের রাজবাড়িটা হানাবাড়ির মতোই একটা কিছু হবে।'

জ্বীনর আলো নয়—ওটা আলেয়া

দুপুরের পর রাতুলদের লঞ্চ বরিশাল ছেড়েছে। তুষখালি আসতে আসতে সন্ধে পেরিয়ে গেলো। দুপুরের পর থেকে রাতুল আর রবি ডেকে বসে যে গল্প শুরু করেছে টেরও পায় নি কখন সূর্য ডুবে গেছে। সূর্য ডোবার পরই সাদা কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে বলেশ্বরী নদী, তীরের গাছপালা আর ঘরবাড়ি। মাঝখানে বেনুদা ওদের ভেতরে ডেকেছিলো চায়ের জন্য। চায়ের সঙ্গে খাওয়ার জন্য ছোড়দি টিন থেকে ক্রিমক্র্যাকার বিস্কিট বের করে দিয়েছিলো। ঝটপট চায়ের পাট চুকিয়ে দিয়ে আবার ডেকে রাখা চালের বস্তার ওপর বসেছে ওরা।

তুষখালি নামেই ঘাট। আশেপাশের জন-মানুষের কোন সাড়াশব্দ নেই। বেনুদা বললো, 'হাটের দিন ছাড়া লোকজন থাকে না।'

ওদের চারজনকে জনশূন্য ঘাটে নামিয়ে দিয়ে খকখক করে কাশতে কাশতে বুড়ো লঞ্চটা সাঁঝরাতের অন্ধকার আর কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেলো। একটু পরে সেই কাশির শব্দও মিলিয়ে গেলো।

ছোড়দি বললো, 'লোকজন না থাক, একটা কুকুর-বেড়ালও কি থাকতে নেই!'

বেনুদা কাষ্ঠ হাসলো—'লোকজন না থাকলে কুকুর-বেড়াল আসবে কোত্থেকে! শুনলাম ক'দিন ধরে ডাকাতিও নাকি বেড়েছে।'

রবি বললো, 'বেনুদা, এই রাতে বাড়ি না গিয়ে ডাকবাংলোয় থেকে গেলে হয় না! মা তো সবসময় বলে ঘাটে সন্ধ্যে হয়ে গেলে যেন ডাক বাংলোয় থেকে যাই।'

'আমিও ভাবছি। লঞ্চটা আজ এক ঘন্টা দেরি করেছে, জোয়ারের উল্টোদিকে আসতে হয়েছে বলে।' এই বলে বেনুদা ছোড়দির দিকে তাকালো—'কি বলো, থাকবে নাকি ডাকবাংলোয়? এখান থেকে দশ মিনিটের পথ।'

ছোড়দি বললো, 'তোমাদের বাড়ি এখান থেকে কদ্দুর?'

'মাইল তিনেকের মতো হবে। ঘন্টাখানেক লাগবে যেতে।'

'মোটে তিন মাইল? তাই বলো! এক ঘন্টার পথ গল্প করেই চলে যেতে পারবো।'

বেনুদা কাষ্ঠ হেসে বললো, 'যেতে পারলে তো ভালোই।'

আমরা যে যার ব্যাগ কাঁধে নিয়ে রওনা হবো এমন সময় কুয়াশা ফুঁড়ে, আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে মাঝবয়সী একটা লোক হারিকেন হাতে উপস্থিত। খসখসে গলায় বললো, 'বড়মেঞা আইয়া পড়ছো নিহি। মুই তো দুইবার ঘুইরা দেইহা গেছি। লঞ্চ দেরি করছে মনে হয়!'

লোকটাকে দেখে বেনুদার দুশ্চিন্তা কেটে গেলো—'এই যে বনমালি, তোমাকে না দেখে আমরা তো বাড়ির দিকে রওনা হচ্ছিলাম।'

বনমালি আঁতকে উঠলো—'হেইয়া কি কও বড়মেঞা! ব্যাগাম সাবে হুনলে মোরে জানে মাইরা ফালাইবে। লও ডাকবাংলায় যাই। সুটকিসডা মোরে দ্যাও দেহি।'

এই বলে বেনুদার হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে বনমালি হাঁটতে শুরু করলো।

বেনুদা একটু অপ্রস্তুত হয়ে ছোড়দিকে বললো, 'এ হচ্ছে ডাক বাংলোর চৌকিদার। চলো, রাতটা এখানে থেকে যাই। সকালে গরুগাড়ি পাওয়া যাবে।'

'বলো কি!' আঁতকে উঠলো ছোড়দি, 'আমি গরুগাড়িতে উঠবো? মরে গেলেও না। একবার চড়ে আমার সারাজীবনের শিক্ষা হয়ে গেছে।'

বেনুদা শুকনো গলায় বললো, 'দিনের বেলা তুমি হেঁটে যাবে কি করে? মা শুনলে আস্ত রাখবেন না আমাকে। গ্রামের লোকজন সবাই আমাদের বাড়ির নতুন বউকে দিনের আলোয় দেখবে—এটা মা কখনো পছন্দ করবেন না।'

'সেজন্যেই বলছি রাতেই চলো যাই। গরুগাড়িতে উঠতে ডাক্তার আমাকে বারণ করেছে, মাকে বুঝিয়ে বললেই হবে।' এই বলে ছোড়দি মুখ টিপে হাসলো।

বনমালি এতোক্ষণ চুপ করে ছিলো। ছোড়দির কথা শুনে কাঁচুমাচু করে বললো, 'মুই একটা কথা কই মা জননী, কিছু মনে কইরো না। গরুগাড়িতে উঠতে অসুবিধা হইলে মুই পালকির ব্যবস্থা করমুহনে। রাইতে এই গেরামে পুরুষমানুষই বাইর হয় না, মাইয়ামাইনষের তো কতাই ওডে না। কষ্ট কইরা রাইতটুকু ডাকবাংলায় থাহেন। মুই হগল ব্যবস্তা কইরা দিমু।'

রাতুল বেনুদাকে বললো, 'আপনি কি আমাদের ভূতের কথা বিশ্বাস করতে বলছেন? এ কথা মেজদারা শুনলে কি বলবে!'

বেনুদা আগের মতো শুকনো গলায় বললো, 'আমি কাউকে কিছু বিশ্বাস করতে বলছি না। আমি শুধু বলতে চাই, যেখানে যে নিয়ম, সে নিয়ম মেনে চলা উচিত।'

রাতুলের মতো ছোড়দিও ডাক বাংলোতে থাকতে রাজি নয়। বললো, 'নিয়ম তো আমরাই বানাই। ও নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। তুমি তো জানো আমার শরীর বেশি ভালো নয়। এক ঘন্টার জায়গায় দু'ঘন্টা হাঁটতে হলেও আমি বাড়ি যাবো। গরুগাড়ির চেয়ে পালকিতে সফোকেশন বেশি হবে। প্লীজ, চলো দেরি না করে বাড়ি যাই।'

বেনুদা কাষ্ঠ হেসে বললো, 'ঠিক আছে, চলো।'

বনমালি হাউমাউ করে উঠলো—'ও বড়মেঞা, তোমার মাতাডা খারাপ হইছে নিহি। হেইয়া কও কি তুমি! মোরে ব্যাগাম সাবে কাইট্যা গাঙ্গে ভাসাইয়া দেবো। মোর কতা হোন ভাইডি। নতুন বউয়ের সর্বনাশ কইরো না।' কথা বলার সময় বনমালি বারবার ভয়ে শিউরে উঠলো।

বেনুদা ওর পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিলো,—'ঠিক আছে বনমালি, মাকে আমি বুঝিয়ে বলবো। তুমি যে মানা করেছো সেটাও বলবো। বউয়ের শরীর বেশি ভালো নয়। ডাক বাংলোয় ওর দেখাশোনা করার অসুবিধে। তুমি মন খারাপ কোরো না।'

বনমালি তবুও ফোঁপাতে লাগলো—'বেয়ানে দারোগা সাবে আইবো আনে। নাইলে মুই তোমাগ লগে যাইতাম আনে। রাইতে একলা আইমু কেমনে?'

'তোমাকে আসতে হবে না।' বেনুদা ওকে আশ্বস্ত করলো—'আমরা চারজন আছি। তুমি বাংলোয় ফিরে যাও।'

বনমালি দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বললো, 'দুগ্‌গা, দুগ্‌গা।'

আকাশে চাঁদ উঠেছে। কুয়াশার জন্য ঘোলাটে মনে হচ্ছিলো চাঁদের আলো। এতো ঘন কুয়াশা যে দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছিলো না। ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা ধরে হাঁটছিলো ওরা চারজন। বেনুদা আর ছোড়দি সামনে। বেনুদার হাতে ছোড়দির সুটকেস। পেছনে রাতুল আর রবি। ওদের গায়ে গরম কোট, কোটের নিচে পুলোভার, পরনে গরম প্যান্ট। মাঝে মাঝে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস

চোখে-মুখে সূঁচ ফোটাচ্ছিলো।

উঁচু রাস্তার দু'পাশে ন্যাড়া ধানক্ষেত। অল্প দূরে ছড়ানো-ছিটানো আবছা বাড়িগুলোকে কুয়াশার সমুদ্রে ভেসে থাকা ছোট ছোট দ্বীপের মতো মনে হচ্ছিলো। কুয়াশাভেজা চাঁদের আলোয় গোটা পরিবেশটা রীতিমতো ভৌতিক হয়ে উঠেছে। দিনের আলোয় রবির সব কথা হেসে উড়িয়ে দিলেও রাতুলের মনে হলো এমন পরিবেশে ভূত, জ্বীন, অশরীরী সবকিছুই থাকতে পারে।

অনেকক্ষণ পর ছোড়দি বললো, 'এতোটা পথ এলাম, একটা মানুষের মুখও দেখলাম না।'

বেনুদা কাষ্ঠ হাসলো, 'দেখা না হলেই বাঁচি।'

ছোড়দি অবাক হয়ে বললো, 'ও কথা বলছো কেন?'

'এ গাঁয়ের একটা বিশেষ ধরনের ব্যাপার আছে। রাতে মানুষজন কেউ পথে বেরোয় না।'

'কেন বেরোয় না?' ভয়ের কথা রাতুল জানলেও ছোড়দিকে কেউ বলে নি।

বেনুদা শুকনো গলায় বললো, 'চোর-ডাকাতের ভয় তো আছেই। তাছাড়া—'

রবি বাধা দিয়ে বললো, 'এসব কথা এখানে বলার কি দরকার বেনুদা? বাড়ি গিয়েও তো বলা যাবে।'

বেনুদা একটু অপ্রস্তুত হলো—'ঠিক আছে। বাড়ি গিয়ে তোর ভাবীকে সব খুলে বলিস।'

রাতুল বললো, 'বেনুদা যে একটু আগে লোকজনের কথা বললেন, দেখা না হলেই বাঁচি, আপনি কি চোর-ডাকাতের কথা বলছিলেন?'

বেনুদা বললো, 'চোর-ডাকাত বাড়িতে লুকিয়ে চুরি করতে পারে। ক'দিন আগে করেছেও। সামানা-সামনি আমাদের মুখোমুখি হওয়ার সাহস ওদের হবে না।'

'তবে কার কথা বলছিলেন?'

রবি বললো, 'লঞ্চে আসার সময় তোকে বলেছি না? তেনারা অনেক কিছুর রূপ ধরতে পারেন।'

ঠিক তখনই রাতুলের মনে হলো চৌদ্দ-পনেরো হাত সামনে একজন মানুষ হেঁটে যাচ্ছে। রবিকে ফিসফিস করে বললো, 'দ্যাখ, কে যেন যাচ্ছে?'

রবি সঙ্গে সঙ্গে রাতুলের একটা হাত আঁকড়ে ধরে বিড়বিড় করে দোয়া-দরুদ পড়তে লাগলো। আর কি আশ্চর্য, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই লোকটা কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেলো।

ছোড়দি প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, 'যাই বলো, আমার কিন্তু হাঁটতে বেশ ভালো লাগছে। কতদিন গ্রাম দেখি নি!'

বেনুদা এবার স্বাভাবিক গলায় বললো, 'শীতকালে এসেছো বলে হাঁটতে ভালো লাগছে। বর্ষাকালে কাদায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়।'

একটু ভয়ভয় করলেও হাঁটতে রাতুলেরও ভালো লাগছিলো। তবে এটাও বুঝতে পারছিলো, এভাবে আসাটা রবি, বেনুদা কেউ পছন্দ করে নি। ওদের ভয়টাকে অবশ্য একটু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছিলো রাতুল আর ছোড়দির। তবে এ নিয়ে বেনুদারা কথা বলতে চায় না বলে ওরা চুপ করে ছিলো।

মাইল দুয়েকের মতো হাঁটার পর ওরা একটা মস্তবড় বটগাছ পেরুলো। বটগাছের তলায় পাথরের মতো জমাট বাঁধা কালো অন্ধকার। বটগাছটার কাছাকাছি আসার পরই রবি ফিসফিস করে রাতুলকে বলছিলো, 'মনে মনে সুরা এখলাস, নয় সুরা ইয়াসিন পড়। উল্টোপাল্টা কোনো কথা বলিস না।'

রবি নিজেও বিড়বিড় করে সুরা পড়ছিলো। বটগাছের তলায় এসে রাতুলের মনে হলো পৃথিবীর বাইরের কোনো জগতে বুঝি পা দিয়েছে। এতো জমাটবাঁধা অন্ধকার মনে হয় ধাক্কা না দিয়ে সরালে বুঝি হাঁটা যাবে না। অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে ছিলো সেই অন্ধকার।

বটগাছের তলা থেকে আবার খোলা জায়গায় এসে হাঁপ ছাড়লো রাতুল। বুকের ওপর ভারি পাথরের মতো জমাট বেঁধে বসেছিলো সেই কালো ছায়া। ঠিকমতো যেন নিঃশ্বাস নিতে পারছিলো না। রাতুলের মতো রবিও খোলা বাতাসে বুক ভরে শ্বাস নিলো। আর ঠিক তখনই শুনলো সেই শব্দ।

ওদের পায়ে চলার শব্দ ছাড়া এতোক্ষণ আর কোনো শব্দ ওদের কানে যায় নি। এমনকি কুকুর কিংবা কোনো নিশাচর পাখির ডাকও নয়। ওরা কান খাড়া করে শুনলো, কাপড়ের খসখস শব্দ আর জুতো পায়ে হাঁটার শব্দ ছাড়াও পরিষ্কার আলাদা এক শব্দ। মনে হচ্ছে ঘষটাতে ঘষটাতে কিছু-একটা যেন ওদের অনুসরণ করছে। রাতুল একবার পেছনে তাকিয়েছিলো। কিছুই দেখা গেলো না। রবি ভয়-পাওয়া যায় চাপা গলায় বললো, 'পেছনে তাকাবি না। সুরা পড়।'

ছোড়দি বেনুদাকে বললো, 'কিসের যেন শব্দ হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছো?'

বেনুদা বললো, 'কথা বোলো না। ও কিছু নয়।'

ছোড়দি কি যেন বলতে গিয়েও বললো না। রাতুল আর রবি বেনুদার কাছাকাছি হাঁটছিলো। রাতুলের একবার মনে হলো, সুন্দরবনের এতো কাছে বাঘ কিংবা কোনো বন্যজন্তু বেরোয় নি তো? রবি আর বেনুদা সত্যি সত্যি ভীষণ ভয় পেয়েছে। একনাগাড়ে বিড়বিড় করে সুরা পড়ছে রবি। এক হাতে খামছে ধরেছে রাতুলের হাত। রীতিমতো কাঁপছিলো ওর হাত। রাতুলের মনে হলো ঘামছেও। বেনুদা হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদেরও একইভাবে জোরে হাঁটতে হচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মনে হলে শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না। বেনুদার হাঁটার

গতি স্বাভাবিক হলো। রবি বিড়বিড় করে বললো, 'একটা ফাঁড়া কাটলো।'

রাতুল অবাক হয়ে জানতে চাইলো, 'কিসের ফাঁড়া?'

'বাড়ি গিয়ে শুনিস কিসের ফাঁড়া। একথা কাউকে বলিস না।'

বেনুদা এক ঘন্টার কথা বলেছিলো। রাতুল ওর হাতঘড়ি দেখলো, এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। রবিকে বললো, 'আর কতদূর?'

রবি স্বাভাবিক গলায় বললো, 'আর বেশি দূর নয়। মিনিট পনেরোর পথ।'

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কিছুটা হালকা হলো। চাঁদের আঁলোয় অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিলো। বেশ দূরে কোথাও কুকুরের ডাক শোনা গেলো। শব্দ শুনে মনে হলো কুকুরটা কাঁদছে। কাঁপা কাঁপা শব্দটা বাতাসে গুমরে মরছে। ডেকেই চলেছে একটানা। দূরে তাকিয়ে দেখলো রাতুল উঁচু টিলার মতো কি যেন। রবিকে বললো, 'উঁচু মতো ওটা কি-রে।'

'ওটাই আমাদের পুরোনো বাড়ি। সেই রাজবাড়ি, যার কথা তোকে বলেছি।'

রবির কথা শুনে রোমাঞ্চ হলো রাতুলের। ভালো করে তাকাতেই হঠাৎ চোখে পড়লো একটা আলো দু'বার দপ করে জ্বলে উঠে নিভে গেলো। চাপা উত্তেজিত গলায় রবিকে বললো, 'দেখেছিস?'

রবি শক্ত করে রাতুলের হাত আঁকড়ে ধরে ভয়-পাওয়া গলায় বললো, 'ওটা জ্বীনের আলো। মাঝে মাঝে দেখা যায়। গ্রামের অনেকে দেখেছে।'

'কি করে বুঝলি ওটা জ্বীনের আলো?'

'আমার দাদা বলেছিলেন।'

'তোর দাদা কি করে বুঝলেন?'

'তোকে বলি নি দাদা খুব এবাদত-বন্দেগী করতেন? দাদা তেনাদের চিনতেন। পরে তোকে সব বলবো।'

'জ্বীনেরা আলো দিয়ে কি করবে?'

'জানি না। এসব কথা এখন থাক না! বললাম তো পরে বলবো।'

রাতুল কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, 'তোদের পুরোনো বাড়ির আশেপাশে কোনো পুরোনো জলা আছে?'

'বিল আছে একটা। অনেক পুরোনো। আগের দিনে ডাকাতরা মানুষ মেরে লাশটা ওটার ভেতর ডুবিয়ে দিতো।'

রাতুল মৃদু হেসে বললো, 'ওটা জ্বীনের আলো নয়। ওটা আলেয়া।'

কে চোর আর কে ভূত বলা কঠিন

বেনুদার মা অতো রাতে সবাইকে দেখে মহা হৈচৈ জুড়ে দিলেন—'যার ন'বছরের হয় না, তা নব্বুইতেও হয় না। তোকে না হাজারবার বললাম, রাতে বাংলোতে থাকিস। বনমালিকে বলে আমি রান্নার ব্যবস্থাও করে দিয়েছি। দেখো তো কান্ড নবুর মা। বউয়ের এক গা গয়না। গেলো বিষ্যুৎবারে বাড়িতে এমন একটা ডাকতি হয়ে গেলো। বেনুটার মাথায় যদি একটুকু বুদ্ধি থাকতো!'

একটানা চেঁচিয়ে যাচ্ছিলেন বেনুদার মা। এরই ফাঁকে ছোড়দি টুপ করে ওর পা ছুঁয়ে সালাম করলো। পেছন পেছন রাতুলও। বেনুদার মা ছোড়দিকে বুকে নিয়ে সমানে বলে চললেন, 'থাক, থাক, বেঁচে থাকো বউমা! কতোদিন ধরে বসে আছি তোমাকে দেখবো বলে। বেনুর বউ দেখার জন্য আল্লা আমাকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছেন। এটি কে? কী সুন্দর ছেলে। তোমার ভাই বুঝি? কী নাম?'

নাম শুনেই, 'ভারি সুন্দর নাম রাতুল। বেঁচে থাকো বাবা। তোমার কথা রবি সবসময় লেখে। তুমি না থাকলে ওর কী যে হতো! কই-রে, তোরা সব গেলি কোথায়! গোসলখানায় গরম পানি দে। ওরা সব হাত-মুখ ধোবে। এতোটা পথ এসেছে। দেখো তো বেনুর কাণ্ড!'—কথা বলতে বলতে বেনুদার মা ভেতরে চলে গেলেন।

রবি একটু হেসে বললো, 'মা একটু বেশি কথা বলে।'

ছোড়দি ওকে আস্তে করে বকুনি দিলো—'ছিঃ, বড়দের কথার খুঁত ধরতে হয় না।'

কথা বলতে বলতে বেনুদার মা আবার এলেন। তাঁর সমবয়সী একজনকে বললেন, 'তোমাকে বলি নি নবুর মা, বেনুর কোনো কথা খেয়াল থাকে না। কি করে যে ও একবারে ডাক্তারি পাস করেছে এখনো আমি ভেবে পাই না।'

রাতুলের ভীষণ হাসি পেলো। ও জানে ডাক্তারি পরীক্ষায় বেনুদার রেজাল্ট খুবই ভালো ছিলো। বেনুদার অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে যেই হাসতে যাবে, ছোড়দির রামচিমটি খেয়ে চেপে গেলো।

নবুর মা গোলগাল চেহারার মোটাসোটা মানুষ। বেনুদাকে বললেন, 'যাই বলো বেনু, কাজটা তুমি ভালো করো নি। তুমি তো সবই জানো। ডাকাতের কথা বাদই দাও না। রাত-বিরেতে তেনাদের নাম নিতে নেই। নজরে পড়তে কতোক্ষণ! তার ওপর পরীর মতো দেখতে বউ।' এই বলে তিনি পাশের বুড়োমতো একজনকে বললেন, 'অ খালা, আমার তো ওজু নেই। সিন্দুকের তাকে মাজারের তাগা তোলা আছে। দোয়া পড়ে বউয়ের গলায় একখানা বেঁধে দিও।'

'নে, আর সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। বউমাকে ঘরে নিয়ে যা। রবি, রাতুলকে তোর ঘরে নিয়ে যা। আবেদালিকে বল দোতলার গোসলখানায় পানি দিতে। কাপড় বদলে মুখ-হাত ধুয়ে নিচে খেতে আয়। কি আক্কেল তোদের!' বেনুদা আর রবিকে ধমক লাগিয়ে বেনুদার মা বোধ হয় রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

রবি বলেছিলো নতুন বাড়ি। দেখে মনে হলো বাড়িটার বয়স আশির কম হবে না। দোতলা বাড়ি, উঁচু ছাদ, সিলিঙে মোটা মোটা বরগা আর কড়িকাঠ। দেয়ালে সুড়কির পলেস্তারার ওপর চুনকাম করা। দেয়ালগুলোও কম মোটা নয়। বড় বড় দরজা-জানালা। জানালায় মোটা লোহার শিক বসানো।

এতোক্ষণ ঘরে ঘরে হারিকেন জ্বলছিলো। রাতুলরা আসাতে কে যেন হ্যাজাক বাতি জ্বালিয়েছে। তাতেও নিচের বড় ঘরটার সবটুকু আলো হয় নি। কোণায় অন্ধকার জমে রইলো। রবি রাতুলকে বললো, 'আমার ঘর দোতালায়। চল ওপরে যাই।'

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে টানা বারান্দার শেষ মাথায় রবির ঘর। রাতুলকে ঘরে বসিয়ে ও নিচে গেলো। শীতের জন্য জানালাগুলো বন্ধ ছিলো। পুরোনো দিনের কাঠের শাটার্সওয়ালা বড় জানালা। রাতুল উঠে দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিলো। ঘরের এক কোণে এতোক্ষণ একটা হারিকেন সামান্য আলো দিচ্ছিলো। জানালা খুলে দিতেই চাঁদের ঠাণ্ডা নরোম আলোয় ঘর ভেসে গেলো। চাঁদের আলোয় রাতুল দেখলো জানালার কাছে মস্ত বড় সেকেলে চেহারার মেহগিনি কাঠের পালঙ্ক। মোটা জাজিমের ওপর তোষক, তার ওপর সাদা চাদর বিছানো। বিছানায় বসে বাইরে তাকাতেই ওর মনটা ভরে গেলো। আকাশের কুয়াশা কেটে গেলেও নিচের সব কিছু সাদা কুয়াশার ফিনফিনে চাদরে ঢাকা পড়েছে। দূরের গাছগুলোকে মনে হচ্ছে কুয়াশার সমুদ্রে দ্বীপের মতো ভাসছে।

নিচের তলায় লোকজন ব্যস্ত গলায় এ ওকে ডাকাডাকি করছে, হারিকেন হাতে ছোটাছুটি করছে। নিজেদের রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো রাতুলের। ওদের জন্য সারা বাড়িতে ব্যস্ততার ঢল নেমেছে।

বেনুদার মা বলেছিলেন রাতে নাকি রাতুলদের জন্য ডাকবাংলায় খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। ঘন্টা দেড়েক পর খেতে বসে ওর মনে হলো এ বাড়িতে

বুঝি সকাল থেকে ওদের জন্য রান্নার আয়োজন শুরু হয়েছে। কয়েক পদের মাছের রান্না, মুরগি, ডাল, ভাজি সব মিলিয়ে দশ-বারোটা আইটেম তো হবেই। রাতুলের খাওয়া দেখে নাদুখালা চোখ কপালে তুললেন, 'পাখির বাচ্চার মতো খুঁটে-খুঁটে কী খাচ্ছো?'—বলে ওর প্লেটে বড় রুই মাছের আস্ত মুড়ো তুলে দিলেন—'না, না বললে তো শুনবো না। বেয়ান শেষে বলুক হাভাতের দেশে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি! এক মাসে আমাদের নবুর মতো শরীর বানিয়ে দেবো।'

রাতুল কিছুই বলতে পারলো না। ওর করুণ মুখ দেখে রবির মায়া হলো। হেসে বললো, 'ঠিক আছে আমি অর্ধেক নিচ্ছি, বাকিটা তুই খা। নইলে খালার মন খারাপ করবে।'

ওই অর্ধেকটুকু খেতে গিয়ে রাতুলের খাবি খাওয়ার দশা। সবশেষে পায়েশ খেতে গিয়ে ও রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। বললো, 'কিছুতেই খেতে পারবো না। পেটে এক ফোঁটা জায়গা নেই।' বেনুদা তখন ওকে রক্ষা করলেন—'থাক মা, এখনো লজ্জা কাটে নি। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। একদিনে এতো বোঝা চাপিও না।'

রাতুলের মনে হলো, অতি উপাদেয় খাওয়ার ব্যাপারটাও কখনো নিরানন্দের হতে পারে। রবি আর বেনুদাকে বলতে হবে, এরকম জবরদস্তি চালানো হলে ও দু'দিনেই কেটে পড়বে।

খাওয়ার পর ভারি শরীরটা টেনে দোতলায় নিয়ে গিয়ে রবির বিছানার ওপর বসে রাতুল বললো, 'তুই তো জানিস রবি, বাড়িতে আমি কতটুকু খাই। সবার সঙ্গে তুইও অমন করলি!'

রবি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'নাদুখালা সবার সঙ্গে ওরকম করেন। মাকে আমি বলে দেবো। এমনটি আর হবে না।'

'না হলেই বাঁচি।' এতোক্ষণ পর রাতুলের মুখে হাসি ফুটলো।

বেনুদা বলেছিলো বটে ঘাট থেকে ওদের বাড়ি তিন মাইল। রাতুলের মনে হলো পাঁচ-ছ'মাইলের কম হবে না। পা দুটো রীতিমতো টনটন করছে। একটানা এতোটা পথ আগে কখনো হাঁটে নি।

রাতের পোশাক পরে রাতুল শুতে যাবে—এমন সময় দেখে মুশকো একটা লোক মস্ত বড় কাঁচের গ্লাসে করে দু'গ্লাস দুধ এনেছে। দেখেই ও আঁতকে উঠলো—'রবি, আমি যদি হার্টফেল করে না মরি তাহলে আত্মহত্যা করবো।' এই বলে চোখের পলকে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো।

রবি হেসে বললো, 'আজ রাতে দুধ খাবো না আবেদালি। কাউকে বলার দরকার নেই। দু'গ্লাসই তুমি খেয়ে ফেলো।'

একগাল হেসে চলে গেলো আবেদালি। বিছানায় উঠে রবি বললো, 'দুধ খাওয়ার ব্যাপারে আবেদালি কখনো আমার সঙ্গে বেইমানি করে নি। যখনই বলি

খেয়ে নেয়। কি স্বাস্থ্য দেখেছিস?'

লেপের তলা থেকে মুখ বের করে রাতুল বললো, 'তোদের আবেদালির মতো ভালো মানুষ পৃথিবীতে মনে হয় খুব কমই আছে।'

হঠাৎ খোলা জানালার দিকে চোখ পড়লো রবির, 'জানালা খুললি কেন? কিভাবে শীত আসছে টের পাচ্ছিস না?'

রাতুল হেসে বললো, 'শীতের চেয়ে বেশি আসছে ভয়। কথাটা পষ্ট করে বলতে লজ্জা পাচ্ছিস কেন?'

রবি সত্যি সত্যি লজ্জা পেলো—'আসলে তুই না থাকলে আমি নবুকে বলতাম থাকতে। আগে সবসময় নবু থাকতো আমার সঙ্গে।'

'নবু কে?'

'নাদুখালার ছেলে। আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় হয়। খালু মারা যাবার পর নবু আর নাদুখালাকে মা এখানে নিয়ে এসেছেন। মা'র খুব ভালো বন্ধু নাদুখালা।'

'আর নবু তোর বন্ধু? ওর কথা তো আগে বলিস নি?'

'কে বললে নবু আমার বন্ধু! আমার চেয়ে এক-দেড় বছরের বড় হবে। এবার ক্লাস নাইনে ওঠার কথা, বাবু পরীক্ষায় ফেল মেরে বসে আছেন।'

'মনে হলো অনেক লোক থাকে তোদের বাড়িতে?'

'অনেক লোক আর কোথায়! নবুরা ছাড়া মা'র এক দূর সম্পর্কের খালা থাকেন, আমরা ডাকি বুঁচি নানী। আর থাকে পুষ্পদি। বিয়ের পর বুজি খুলনা চলে গেছে। কালেভদ্রে আসে। বাকি সব তো কাজের লোক।'

'তোর মা তখন তোদের বাড়িতে ডাকাতির কথা কি বলছিলেন যেন। সত্যি সত্যি ডাকাত পড়েছিলো?'

'তোকে তো বলাই হয় নি।' উত্তেজনায় শোয়া থেকে উঠে বসলো রবি। 'গত বিষ্যুৎবারে ডাকাত এসেছিলো আমাদের বাসায়। বেনুদা ছিলো বরিশালে। প্রথম কেউ টের পায় নি। নতুন বউয়ের জন্যে মা ট্রাঙ্কে দু'সেট গয়না তুলে রেখেছিলেন। একটা ছিলো জড়োয়ার সেট। তার ওপর এক ট্রাঙ্ক শাড়ি। ট্রাঙ্কসুদ্ধো নিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় কিসের শব্দে নাদুখালার ঘুম ভেঙে গেছে। তাকিয়ে দেখেন কালো কালো কতোগুলো ভূতের মতো মাথায় কি নিয়ে যেন উঠোনে চলাফেরা করছে। দেখেই উনি ফিট হয়ে গেছেন। কাউকে ডাকতেও পারেন নি।'

'পুলিসে খবর দেয়া হয় নি?'

'সে তো দিয়েছেই। দিলেইবা কি। পুলিস কবে চোর-ডাকাত ধরেছে বল!'

'তোর নাদুখালার অতোবড় শরীর। ডাকাত দেখে স্রেফ ফিট হয়ে গেলেন?'

'ফিট হয়েছিলেন বলে জানে বেঁচেছেন। চেঁচিয়ে জান খোয়াবেন নাকি?

ওগুলো সত্যিকারের ডাকাত হলেও রক্ষা ছিলো না।'

'সত্যিকারের ডাকাতই ছিলো ওগুলো। জ্বীনরা নতুন বউয়ের গয়না চুরি করেছে, এ কথা যদি ওদের কানে যায়, তাহলে তোকে আর ওরা আস্ত রাখবে না।'

শুকনো গলায় রবি বললো, 'সব জ্বীন ভালো, তোকে কে বলেছে? খাবিস জ্বীনও আছে! ওরা সব সময় মানুষের অনিষ্ট করার ফিকিরে থাকে।'

'তুই দেখছি রীতিমতো জ্বীনবিশারদ হয়ে গেছিস। তোদের রাজবাড়ি না হানাবাড়ির ভালো জ্বীনদের বল না, গয়নাগুলো কে নিয়েছে ধরিয়ে দিতে।'

'তুই ঠাট্টা করছিস। আগের দিন হলে ঠিকই ওদের বলা যেতো। তোকে বলি নি আমার বড়দাদুর কাছে দুটো জ্বীন পড়তো।!'

'কি পড়তো? বাংলা, ইংরেজি না অঙ্ক?'

'তুই জ্বীনদের নিয়ে ঠাট্টা করিস না। ওরা বাংলা, ইংরেজি পড়তে যাবে কেন? ওরা পড়তো কোরান শরীফ। বড়দাদুর মতো কোরান শরীফের তফসীর কেউ করতে পারতো না।'

'পড়াশোনা শেষ করে কি করলো ওরা? নিশ্চয় চাকরি-বাকরি খুঁজতে বেরোয় নি।'

'ওদের চাকরির দরকার হবে কেন! ওরা তো সবসময় আল্লার এবাদত-বন্দেগী করে। তবে বড়দাদুর কাছে যারা পড়তো, ওরা পড়া শেষ না করেই চলে গিয়েছিলো।'

'কেন, ছাত্র হিসেবে বুঝি সুবিধের ছিলো না? খুলেই বল না!'

'কি যে বলিস!' কাষ্ঠ হেসে রবি বললো, 'আসলে বড়দাদুর কাছে অনেক দূর থেকে তালেব এলেমরা আসতো কোরানের তফসীর শোনার জন্য। আমাদের বাড়িতেই থাকতো। আমার দাদা তখন ছোট ছিলেন। জ্বীন দুটোকে নিজ চোখে দেখেছেন। ধবধবে ফর্সা ছিলো গায়ের রঙ। চামড়া ছিলো মাখনের মতো মোলায়েম। বড়দাদু প্রথমটায় বুঝতে পারেন নি ওরা যে জ্বীন। জানেন দূরে কোথাও থেকে এসেছে। অন্য সবার চেয়ে পড়াশোনার দিকে মন বেশি। একদিন আর সবাই চলে গেছে। বড়দাদু আর ওরা দু'জন বসে কথা বলছে। বড়দাদু কি কার জন্য একটা তাবিজ লিখতে বসলেন। লিখতে লিখতে বললেন, পাশের ঘর থেকে কোরান শরীফটা এনে দাও তো। সঙ্গে সঙ্গে কোরান শরীফ এসে গেলো। বড়দাদুর কেন যেন মনে হলো ওদের কেউ বসা থেকে ওঠে নি। লেখার কাজ শেষ করে আবার বললেন, যাও, রেখে এসো। এই বলে আড়চোখে তাকিয়ে দেখেন, ওরা বসেই আছে। একজনের হাতখানা লম্বা হয়ে গেলো। বসে থেকেই পনেরো হাত দূরে তাকের ওপরে কোরান শরীফ রাখলো। তারপর আবার হাত খানা আগের মতো। বড়দাদু কাজ শেষ করে বললেন, তোমাদের একটা কথা

জিজ্ঞেস করবো, আশা করি সত্যি জবাব দেবে। ওরা বললো, আমরা মিছে কথা বলি না হুজুর! বড়দাদু বললেন, তাহলে সত্যি করে বলো তোমরা কে। তোমরা তো মানুষ নও। ওরা বললো, হুজুর, আমরা জ্বীন। বড়দাদু বললেন, এতোদিন নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে রেখেছিলে কেন? কাঁচুমাচু করে জ্বীন বললো, আমরা ভেবেছিলাম, আমাদের পরিচয় জানলে আপনি পড়াবেন না।

'বড়দাদু বললেন, পরিচয় যখন জেনেছি তখন সত্যি সত্যি তোমাদের পড়াতে পারবো না। ওদের তখন সে কি কাকুতি-মিনতি। বড়দাদু ছাড়া আর কারো কথা ওদের জানা নেই। বললো, কোনো বেয়াদবি করবে না। বড়দাদু তবুও রাজি হলেন না। বললেন, দেখ বাপু, আমি জানি তোমাদের গা-ভর্তি রাগ। আল্লাহ্‌তালা তোমাদের আগুন দিয়ে বানিয়েছেন। আমার এখানে আদমের আওলাদরা সব পড়ে। ওদের কে কখন বিনা ওজুতে থাকে, না জানি কি বেয়াদবি করে, তোমরা সহ্য করতে পারবে না। ঠিক মেরে ফেলবে। না বাছা, তোমরা চলে যাও। ওরা তো কিছুতেই যাবে না। বড়দাদুর পা ধরে পড়ে রইলো। শেষে বড়দাদু বললেন, ঠিক আছে, তোমরা পুরোনো বাড়িতে গিয়ে থাক। সবার সঙ্গে তোমাদের পড়াবো না। রাতে মসজিদে আমি যখন একা থাকবো তখন গায়েবী শরীরে এসো। যা পড়তে চাও পড়িয়ে দেবো। তবে তোমাদের ততোটুকু পড়াবো, যতোটুকু তোমাদের জানা উচিত। তোমরা তো জানো, কোরান শরীফের সবটুকু তোমাদের পড়ানো যাবে না। ভালোই করেছো পরিচয় দিয়ে। নয়তো অন্য সবার সঙ্গে তোমাদের কি না কি পড়িয়ে দিতাম, পরে আল্লাহ্‌পাকের কাছে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হতো। এরপর অবশ্য বেশিদিন ওরা পড়ে নি। তবে দাদুর কাছে শুনেছি কারা নাকি মাঝে মাঝে উঠোনে অসময়ের আর অচেনা সব ফল রেখে যেতো। দাদু পরে বুঝেছেন এসব জ্বীনদের কাজ।'

বিশ্বাস না হলেও রবির গল্প শুনে রাতুলের রোমাঞ্চ হলো। কললো, 'হ্যাঁরে, এতো সুন্দর বলিস তুই, গল্প লিখিস না কেন?'

রবি মৃদু হাসলো, 'এ-সব কথা বহুবার আমরা দাদুর কাছে শুনেছি। এ বাড়ির সবাই জানে।'

খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস আসছিলো। তবে ভারি লেপের তলায় শীত ঢোকার কোনো রাস্তা ছিলো না। চাঁদ পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। চাঁদের আলো না থাকলেও জানালা দিয়ে আসা আবছা আলোয় ঘরের জিনিসপত্রের কালো অবয়ব বোঝা যাচ্ছিলো। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রাতুলের মনে হলো, সত্যি যদি কোনো জ্বীন লম্বা হাত বাড়িয়ে দেয়! কথাটা মনে হতেই রবিকে বললো, 'জানালা দিয়ে কেউ যদি লম্বা একটা হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে তুই কি করবি, বল তো?'

রবি লেপ টেনে মুখ ঢেকে বললো, 'মিছেমিছি ভয় দেখাবি না বলে দিচ্ছি। কাল নবু এলে তোকে একা পাশের ঘরে শুতে পাঠাবো। তখন বুঝবি কেমন লাগে!'

রাতুল গম্ভীর হয়ে বললো, 'তোকে ভয় দেখাবার জন্য বলছি না। সেদিন একটা বইয়ে পড়েছি, চোরেরা বাঁশের গায়ে কাপড় পেঁচিয়ে, মাথায় একটা হুক বেঁধে জানালা দিয়ে ঘরের জিনিসপত্র সব বের করে নেয়। একজন সাহস করে বাঁশটা ধরে চিৎকার দিতেই, চোর বাঁশ ফেলে দৌড়। এমন যদি হয় কখনো চ্যাঁচাবি না। বাইরে গিয়ে চুপিচুপি জাপটে ধরতে হবে চোরটাকে।'

'তোর সাহস থাকে তো তুই ধরিস।'

'তুই অতো ভয় পাচ্ছিস কেন? ভূতের কথা বলছি না। বলছি চোর ধরার কথা। সেদিন তোদের বাসায় এতো বড় চুরি হলো, ফের যদি আসে?'

'আমাদের এখানে কারা চোর, কারা ভূত একথা কেউ হলপ করে বলতে পারবে না।'

'তুই কি বলতে চাস ভূত চুরি করে?'

'ওদের যখন যা ইচ্ছে তখন তাই করে। নিকেরিরা বলে, রাতে পাহারা না দিলে ওদের সব মাছ মেছো-ভূত চুরি করে নিয়ে যায়।'

'কেন, চোর-ডাকাতের বুঝি মাছ খেতে ইচ্ছে করে না?'

'সারা রাত বকবক না করে ঘুমোতে দে।'

রবি পাশ ফিরে শুলো। রাতুল ওর বুকের ঢিবঢিব শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো। মনে হলো রবিদের গোটা বাড়িটাকে কেউ যেন ভয়ের কালো আলখাল্লা দিয়ে মুড়ে দিয়েছে।

একমাত্র সাহসী ছেলে নবুর সঙ্গে পরিচয়

রবিদের গোটা বাড়িতে রাতুল একমাত্র সাহস দেখলো নবু নামের ছেলেটার। রবি ওর কথা যতোটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিলো, ওকে দেখার পর রাতুলের ধারণা পাল্টে গেলো। বয়সে সামান্য বড় হবে, চমৎকার পেটানো

শরীর। আর রবিদের বড় পুকুরটা আধঘন্টার ভেতর সাঁতার কেটে দু'বার এপার-ওপার করে। কাঠবেড়ালির মতো তরতর করে নারকেল গাছ বাইতে পারে। নৌকা চালায় ঝড়ের মতো।

ওর সঙ্গে রাতুলের দেখা হলো এ বাড়িতে আসার দু'দিন পর। নবু মঠবাড়িয়া গিয়েছিলো ফুটবল খেলতে। সন্ধেবেলা এলো সারা গায়ে ধুলো-কাদা মেখে। রাতুলকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে হাসলো। সঙ্গে সঙ্গে রাতুলেরও ওকে ভালো লেগে গেলো।

গত দু'দিন ধরে রোজ সন্ধেবেলা দোতলার বারান্দায় বসে নাদুখালা পান চিবুতে চিবুতে ভূতের গল্প শোনান। যেদিন নবু এলো সেদিনও রাতুলরা বারান্দায় মাদুর পেতে ভূতের গল্প শুনছিলো। আস্ত একটা পান মুখে ফেলে খানিকটা চিবিয়ে ঢক করে পিকটুকু গিলে ফেলে নাদুখালা বললেন, 'তোমরা হলে শহরের ছেলে। তেনাদের দেখবে কি করে। গাঁয়েও কি সবাই দেখে নকি! দেখেছিলেন নবুর দাদা। এক রাতে ঘাটে বসে এশার নামাজের ওজু করছেন। আকাশে ফকফকে জোছনা ছিলো। হঠাৎ দেখেন পুরোনো গোরস্থানের ভেতর একজন মানুষ হাঁটছে। ভাবলেন অন্য গাঁয়ের কেউ হবে, পথ ভুলে সেখানে চলে গেছে। নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে। এ গাঁয়ের কেউ রাতে পুরোনো গোরস্থানে যায় না। নবুর দাদা ঘাটের ওপর উঠে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে গো, কোত্থেকে এসেছো, যাবে কোথায়? লোকটা কোনো কথা না বলে রাজবাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলো। সাহস ছিলো বটে নবুর দাদার। বদনা হাতে লোকটার পিছু নিলেন। বারবার বললেন, তুমি কথা কও না কেন? ওদিকে কেন যাচ্ছো? লোকটা তবু কথা বলে না। হাঁটছে তো হাঁটছেই। পুরোনো বাড়ির কাছে যখন এসেছে তখন নবুর দাদার ভারি রাগ হলো। পা চালিয়ে কাছে গিয়ে বললেন, তুমি চোর না ডাকাত! রা করো না কেন? এমন সময় মানুষটা ফিরে তাকালো। আল্লা গো! তিনি তখন দেখেন লোকটার কোনো চোখ নেই। চোখের জায়গাটা সমান। লোকটা মাথা নোয়ালো। নবুর দাদা পষ্ট দেখলেন, মাথা ভর্তি অনেকগুলো চোখ জ্বলজ্বল করছে। সে কি চাহুনি! নবুর দাদাকে যেন গিলে খাবে। বদনাটা লোকটার দিকে ছুঁড়ে মেরে চিৎকার করে তিনি বাড়ির দিকে ছুটলেন। ঘরের দরজার ওপর এসে বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। সবাই ধরাধরি করে বিছানায় এনে শোয়ালো। তিনি সেই যে বিছানা নিলেন আর উঠলেন না। দু'বছর পর বেহেশতে চলে গেলেন।'

গল্প শেষ করে মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নাদুখালা আরেক খিলি পান মুখে দিলেন।

আমাদের সঙ্গে গল্প শুনতো আবেদালি। রবিদের অনেকগুলো গরু ছিল। সেই গরুদের দেখাশোনা করতো আবেদালি। বিরাট দশাসই শরীর। গায়ে ভীষণ

জোর। দাঁত দিয়ে নারকেল ছিলতো, ঘুষি মেরে কাঁচা ডাব ফাটাতো। সেই লোকটা ভূতের গল্প শুনে এতো ভয় পেতো যে, দেখে রাতুলের মায়া হতো। গল্প শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে ওর মনে হতো এই বুঝি আবেদালি ভির্মি খাবে। বুকে থুথু ছিটিয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলতো। কখনো ও নিজেই বলতো রাজবাড়ি আর পুরোনো গোরস্থানের ভূতের গল্প। গল্প শেষ না হতেই বলতো, 'মুই আর কইতে পারুম না। নাদুখালা আপনেই কন।'

সেদিন এমনি এক জমজমাট গল্পের আসরের মাঝখানে এলো নবু। নাদুখালা বেনুদার মা'র মতো নবুকে নিয়ে পড়লেন—'রাত-বিরেতে না এলে বুঝি ঘুম হতো না। যে চুলোয় দু'রাত থাকা হয়েছে, সেখানে কি তিনরাত থাকা যেতো না! তোকে এতোবার বলেছি সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরবি না, একদিনও কি আমার কথা কানে তুলতে নেই?'

নবু আড়চোখে একবার রাতুলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমার কিছু হবে না মা। তুমি মিছেমিছি ভয় পাও।'

'ফের তর্ক করিস? তোকে আমি খড়মপেটা করবো। তোর জুলপি ছিঁড়ে ফেলবো। ফুটবলটাকে বটি দিয়ে কুচি কুচি করে কাটবো। তবে যদি আমার রাগ যায়।'

'তাতেও রাগ যাবে না। ওসব কাজ পরে কর। আগে খেতে দাও। ভীষণ খিদে পেয়েছে।' এই বলে নবু আমাদের সঙ্গে বসলো।

নাদুখালা গজগজ করতে করতে উঠে গেলেন। রাতুলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো নবু। বললো, 'তুমি নিশ্চয়ই রাতুল। খালাকে রবি যতোগুলো চিঠি লিখেছে, সবগুলোতে তোমার কথা আছে।'

রবি মুখ গোমড়া করে বললো, 'আমার চিঠি তোকে কে পড়তে দিয়েছে শুনি? মাকে বলে তোকে যদি মার না খাওয়াই।'

নবু হাসলো—'মার খাওয়া যে আমার জন্য ডালভাত, তুই ভালো করেই জানিস।' এরপর নবু গম্ভীর হয়ে বললো, 'শহরে গিয়ে তুই গ্রামের কথা একেবারে ভুলে গেছিস রবি।একটা চিঠিতেও আমার কথা জানতে চেয়ে লিখিস নি।'

রবি অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'তোর কথা জানতে চাওয়ার আগেই তো মা সব লিখে জানিয়ে দেন। এই যে তুই পরীক্ষায় ফেল করলি—মা গত চিঠিতেই লিখেছিলেন।'

ফেলের কথা শুনে নবুর অপ্রস্তুত হওয়ার পালা—'আমাকে কতো কাজ করতে হয় জানিস? ঠিকমতো পড়ার সময় পেলে তো!'

'কাজ তো শুধু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। কার আছাড় খেয়ে কোমর ভেঙেছে, সদরে নিয়ে যাও। কার মামলার তারিখ পড়েছে, সদরে নিয়ে যাও। কোথায় জমি নিয়ে মারপিট হবে, লাঠি নিয়ে যাও। সারা বছর এসব

করলে পড়ার সময় পাবি কখন?

নবু গম্ভীর হয়ে বললো, 'তুই ভালো করেই জানিস, মানুষের আপদে-বিপদে কেউ ডাকলে আমি না গিয়ে পারি না।'

রবি ফোড়ন কাটলো, 'পৃথিবীর সব আপদ যদি তুই দুর করবি—ফেল করার জন্যে দুঃখ করিস কেন?'

রাতুল এতোক্ষণ চুপ করে ছিলো। রবি যেভাবে নবুকে খোঁচাচ্ছিলো, ওর ভালো লাগছিলো না। রবিকে বললো, 'তুই কিন্তু নবুর কথা আগে কখনো আমাকে বলিস নি।' তারপর নবুকে বললো, 'এ বাড়িতে এসে অব্দি ভূতের গল্প শুনতে শুনতে হয়রান হয়ে গেছি। তোমার খেলার খবর বলো। জিতলে না হারলে?'

নিজের বাড়িতে নবু এই প্রথম এমন একজনের দেখা পেলো, যে ওর খেলার খবর জানতে চেয়েছে। ভাবলো, 'রাতুলের মতো আমার যদি একটা বন্ধু থাকতো!' সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ওরা শহরের ছেলে, ওর মতো গেঁয়ো ছেলেকে পছন্দ করবে কেন? রাতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো, সেও ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মৃদু হেসে বললো, 'ফুটবলে আমাদের তুষখালিকে হারাবে এ তল্লাটে কেউ আছে নাকি! খেলতে গেছি মঠবাড়িয়ায়। সেখানেও রাজবাড়ির ভূত। ওদের গেম টিচারকে বলতে শুনেছি, আমার ওপর নাকি রাজবাড়ির ভূত সওয়ার হয়েছিলো। নইলে ডবল হ্যাট্রিক করলাম কি করে!'

রবি রাতুলকে বললো, 'নবু তোর মতো, জ্বীন ভূত বিশ্বাস করে না।'

আবেদালি এতোক্ষণ ওদের কথা শুনছিলো। রবির কথা শুনে ওর রাগ হলো—'তেনাগো নিয়া মশকরা হরণ ভালো না। যেদিন অপঘাতে মরবেহ্ হেইদিন নবুদাদা বুজবেহেনে।' এই বলে সে উঠে চলে গেলো।

আবেদালির কথার ধরন দেখে নবু আর রাতুল কোরাসে হাসলো। রবিও হাসলো, যদিও ওর মোটেই হাসি পাচ্ছিলো না। মনে মনে ও কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিলো এই দুই অবিশ্বাসীকে নিয়ে। নবু একা হলে নাদুখালাকে বলে শায়েস্তা করা যেতো। রাতুলকে কিছু বললে বেনুদা আস্ত রাখবেন না। তাছাড়া ও এ বাড়ির মেহমান। মনে মনে ও রাজবাড়ির জ্বীনের উদ্দেশ্যে বললো, 'আপনাদের নিয়ে আমি কখনো হাসি-ঠাট্টা করি নি। আমার ওপর আপনারা রাগ করবেন না।'

নবু রাতুলকে উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে বিকেলের ফুটবল ম্যাচের কথা বলছিলো। এমন সময় বেনুদা এসে বললো, 'মুন্সিবাড়িতে রাতে মিলাদের দাওয়াত। আমাদের নেমন্তন্ন করেছে।'

মিলাদে যাওয়ার কথা শুনলে রাতুলের গায়ে জ্বর আসে। মুখ কালো করে বললো, 'আমারা না গেলে হয় না বেনুদা? শরীরটা বেশি ভালো লাগছে না।'

বেনুদা মৃদু হাসলো, 'বুঝেছি। তোমার ছোড়াদিও যাচ্ছে না। রবি তৈরি হয়ে নে।' এরপর কৈফিয়তের সুরে বললো, 'আমাদের পীরের বংশ। কারো বাড়ির মিলাদে না গেলে গ্রামে দশ কথা উঠবে।'

রাতুল ব্যস্ত গলায় বললো, 'না না, ঠিক আছে। আপনারা যান। নবুও যাবে নাকি?'

নবুর অবশ্য মিলাদে যেতে আপত্তি নেই। তবে রাতুল যাবে না শুনে ও বেনুদাকে বললো, 'রাতুল বাড়িতে একা থাকবে। আমি কি যাবো?'

'তুই থাক তাহলে।' এই বলে বেনুদা রবিকে নিয়ে চলে গেলো।

নাদুখালা উঠে যাওয়ার পরই গল্পের আসর ভেঙে গেছে। রবি চলে যাওয়ার পর দোতালার বারান্দায় রাতুল আর নবু ছাড়া আর কেউ রইলো না। রাতুল বললো, 'মিলাদের উপলক্ষটা কি?'

নবু হাসলো, 'এ গাঁয়ে মিলাদ পড়ানোটা রুটিন। খাবিস জ্বীনের আসর থেকে বাঁচার জন্য যাদের সামর্থ্য আছে তারা ফি হপ্তায় মিলাদ পড়ায়। আমাদের মসজিদের হুজুর ইমামতি করে যা পান, সারা মাস মিলাদ পড়িয়ে তার চেয়ে বেশি পান।'

রবিদের সদর পুকুর পাড়ের মসজিদে এশার নামাজের আজান পড়লো। নিচের তলা থেকে নাদুখালা ডাকলেন, 'নবু, রাতুলকে নিয়ে খেতে আয়।'

নবুর সঙ্গে খেতে বসে রাতুলের মুখে হাসি আর ধরে না। নাদুখালা যতোবার ওর পাতে খাবার তুলে দেন, রাতুল লুকিয়ে সেগুলো নবুর পাতে পাচার করে দেয়। নবুর পাতের দিকে নাদুখালার মোটেই নজর নেই। জানেন, ওকে তুলে দিতে হয় না। খাওয়ার পর নাদুখালা মুখ টিপে হেসে বললেন, 'এ্যাদ্দিনে রাতুলকে খাইয়ে সুখ পেলাম।'

নবু হাসতে গিয়ে বিষম খেলো। নাদুখালা ওর মাথায় থাবড়া মারতে মারতে বললেন, 'অসময়ে কোন মুখপোড়া তোর কথা মনে করলো! খবরদার, রাতুলরা যদ্দিন আছে কোথাও যাবি না।'

নবুর বিষম খাওয়ার কারণ রাতুলের জানা থাকলেও, মুখখানা এমন ভালো মানুষের মতো করে রাখলো, যেন ও কিছুই জানে না।

খেয়ে উঠে ওরা দোতলার ছাদে গিয়ে বসলো। নবু বললো, 'রবি আসার আগে নিচে নেমে যেতে হবে। রাতে ছাদে উঠেছি জানলে মা আমাকে আস্ত রাখবে না।'

নবুর মার খাওয়ার কথা রবিও কয়েকবার বলেছে। ওর জন্য রাতুলের মনটা খারাপ হয়ে গেলো। বললো, 'তোমাকে বুঝি নাদুখালা খুব মারেন?'

'বারে, কথা না শুনলে মারবে না! পরীক্ষায় খারাপ করেছি বলে বেনুদা কি কম মেরেছে?'

'পরীক্ষায় ভালো করলে না কেন নবু?'

রাতুলের সমবেদনাভরা কথা নবুর মন ছুঁয়ে গেলো। বললো, 'রবি কি বললো, শোন নি?'

'শুনেছি। মানুষের বিপদে তুমি সাহায্য করো, এটা খুবই ভালো কথা। তবে লেখাপড়া শিখে যখন নিজের পায়ে দাঁড়াবে, তখন অনেক বেশি সাহায্য করতে পারবে।'

রাতুলের কথা শুনে ম্লান হাসলো নবু। বললো, 'তোমাকে আমার ভালো লেগেছে বলেই বলছি রাতুল। রবিদের বাড়িতে আমরা আশ্রিতের মতো আছি। বেনুদা, রবি শহরে থাকে। এ বাড়ির খাজনা, কাচারি, মামলা সব কাজ নিয়ে আমাকেই সদরে দৌড়াতে হয়। পরীক্ষার ক'দিন আগেও তিনদিন সদরে গিয়ে থাকতে হয়েছিলো। কাজ করতে আমার এতোটুকু কষ্ট হয় না। তবে পড়ার সময় ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায় না। এবার অঙ্ক পরীক্ষার আগের দিন শুনি নিকেরিপাড়ায় কলেরা লেগেছে। ওরা বললে আসবে না, তই গঞ্জে গিয়ে আমাকেই ডাক্তার আনতে হলো। এ গাঁয়ে লেখাপড়ার চল মাত্র চার-পাঁচটা বাড়িতে আছে। যারা লেখাপড়া করে তারা সবই হয় বরিশাল, নয় ঢাকায় গিয়ে থাকে। রবিকেই দেখ না। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার আগেই গাঁ ছেড়ে চলে গেলো।'

রাতুল বললো, 'তোমার ইচ্ছে করে না শহরে গিয়ে পড়াশোনা করতে?'

'ইচ্ছে তো করেই। ম্যাট্রিকে ভালো করতে পারলে ডাক্তারি পড়বো আমি। তবে বেনুদার মতো শহরে চাকরি করবো না। গাঁয়েই থাকবো। আমার তো বেশি পয়সা কামানোর দরকার নেই। মা আর আমি—মাত্র দু'জন।' এই বলে একটু ইতস্তত করলো নবু। তারপর বললো, 'তুমি যদি কিছু মনে না করো আমি একটা সিগারেট খাবো। বাড়িতে লুকিয়ে খেতে হয়।'

রাতুল হেসে বললো, 'খেতে পারো। মনে করার কি আছে। একবার আমি বড়দার কৌটো থেকে একটা টেনে দেখেছিলাম।, ভালো লাগে নি।'

নবু সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'রবিকে আবার বলে দেবে না তো?'

'আমাকে তোমার ওরকম মনে হয় নাকি!'

'না না, এমনি বললাম।'

'রবি কিন্তু জানে তুমি যে সিগরেট খাও!'

'তোমাকে বলেছে বুঝি! কি জানি, কখনো আড়াল থেকে দেখেছে হয়তো।'

'ও তো বাড়িতে বলে দিতে পারে।'

'এমনিতে বলবে না। আমি ওর কোনো কথা না শুনলে বলতে পারে। আর বললেই বা কি। একটু পিটুনি খেতে হবে। ওসব আমার গা-সহা হয়ে গেছে।'

'না খেলেই তো পারো।'

'আসলে কি জানো, সারাক্ষণ আমাদের কাদা-পানিতে থাকতে হয়। তাই একটু বিড়ি-তামাক না খেলে শরীরে জুত লাগে না। গাঁয়ে সাধারণ মানুষের ঘরে আমার বয়সী তুমি একজনও পাবে না, যে বিড়ি-তামাক খায় না।'

নবু বুঝতে পারলো ওর সিগারেট খাওয়াটা রাতুলের পছন্দ হয় নি। তাই একটু পরে হেসে বললো, 'যখন শহরে যাবো, তখন সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেবো।'

রাতুলের খুব ভালো লাগলো, ওর পছন্দ-অপছন্দকে নবু গুরুত্ব দিচ্ছে বলে। হাত বাড়িয়ে হেসে বললো, 'কথা দিচ্ছো তাহলে।'

রাতুলের হাতে হাত রেখে নবুও হেসে ফেললো—'কথা দিলাম।'

দু'দিনের ভেতর রাতুলের সবচেয়ে কাছের মানুষ হয়ে গলো নবু।

রবিকে জব্দ করার ষড়যন্ত্র

নবুর সঙ্গে রাতুলের বেশি মেলামেশা রবির মোটেই ভালো লাগে নি। ওর ভয় নবু রাতুলকে সিগারেট খাওয়া শেখাবে, নিকেরিপড়ায় নিয়ে গিয়ে আজেবাজে লোকের সাথে মিশবে, খারাপ খারাপ কথা বলবে, রাজবাড়ির জ্বীনদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে। এসব ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলো রবি। রাতুলের যদি কিছু-একটা হয়ে যায়, ওদের বাড়ি গিয়ে মুখ দেখানো যাবে না।

নবু যখন ছিলো না, আবেদালি রাতুলকে সাঁতার শেখাতে নিয়ে যেতো, বিকেলে নৌকায় করে বেড়াতে নিয়ে যেতো। বলা ছিলো আবেদালি যেন সব সময় রাতুলের সঙ্গে থাকে। নবু আসার পর আবেদালি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। ওর কাজগুলো মহা আনন্দে নবু নিজের ঘাড়ে তুলে নিলো। রবি বহুদিন পরে বাড়ি এসেছে। ওকে প্রায় আত্মীয়-স্বজন কিংবা প্রতিবেশীদের বাড়িতে দাওয়াত খেতে যেতে হয়। রাতুল মাত্র দু'রাত গিয়েছিলো, তাও ছোড়দির বকুনির পর।

যেদিন রবিদের চরের জমি নিয়ে কি-এক পুরানো মামলার শুনানির জন্য ও আর বেনুদা দু'দিনের জন্য বরিশাল গেলো—নবু-রাতুলকে পায় কে! রবি অবশ্য রাতুলকেও নিয়ে যেতে চাইলো। বললো, 'তোর কোনো অসুবিধা হবে না।

কাকাদের বিরাট বাড়ি রয়েছে বরিশালে। একবয়সী ছেলেমেয়েও পাবি। মেজকাকার মেয়ে আছে একটা। ক্লাস এইটে পড়ে। ভীষণ সুন্দর দেখতে, চমৎকার গান গায়। চল, পরিচয় করিয়ে দেবো।'

রাতুল তবু যায় নি। বলেছে, 'তোদের বাড়িতে যে ক'দিন আছি সাঁতার আর নৌকা চালানোটা ভাল করে শিখতে চাই। তাছাড়া সবাই চলে গেলে ছোড়দি একা হয়ে যাবে।'

শুনে রবির ভারি রাগ হলো। মনে মনে বললো, 'ছোড়দির চিন্তায় যে ঘুম হচ্ছে না সে তো ভালো করেই জানি। আল্লা জানে দুই শয়তান মিলে কি অঘটন ঘটায়!'

রবি চলে যেতেই রাতুল আর নবু হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়লো। নবু বললো, দু'দিন মন খুলে কথা বলা যাবে।' রাতুল বললো, 'যা খুশি তাই করা যাবে।'

নবু বললো, 'এতোদিন খালে নৌকা বেয়েছি। আজ চলো নদীতে যাই।'

'বেশ তো চলো।' নবুর কোনো কথাতেই রাতুল গর-রাজি নয়।

দুপুরে খেয়েই ওরা দু'জন বেরিয়ে পড়লো। রবিদের বাড়ি থেকে মাত্র দশ মিনিটের পথ মরাখাকি খাল। আবেদালির কাছে রাতুল শুনেছে এই খালের পাড়ে হিন্দুদের শ্মশানঘাট ছিলো। এখান থেকে অবশ্য বেশ দূরে। যারা গরিব, ভালোমতো পোড়াতে পারতো না, আধপোড়া করে খালে ভাসিয়ে দিতো। মড়া খাওয়ার জন্য নদী থেকে কুমির চলে আসতো খালে। তখন থেকে এই খালের নাম মরাখাকি। একবার নিকেরিদের জালে ধরা পড়েছিলো একটা বুড়ো কুমির। এখন অবশ্য শ্মশানঘাট সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেশ্বরীর তীরে।

পৌষের শেষে ভরদুপুরেও রোদের এতোটুকু তেজ নেই। দু'পাশে ন্যাড়া ধানক্ষেতের ভেতর খালটা নদীতে গিয়ে মিশেছে। নবুই বৈঠা বাইছিলো। রাতুলের হাতের ব্যালেন্স মোটামুটি ঠিক হলেও বৈঠা মারার কায়দা এখনো পুরো রপ্ত করতে পারে নি। বৈঠা বেশি ডুবিয়ে ফেলে বলে অল্পক্ষণের ভেতর ওর হাঁপ ধরে যায়, নৌকাও চলে আস্তে।

আধঘন্টার মধ্যে ওদের নৌকা বলেশ্বরীতে এসে পড়লো। বেশ চওড়া নদী। ঢাকার বুড়িগঙ্গার চারগুণ হবে।

নবু বললো, 'সুন্দরবন এখান থেকে বেশি দূরে নয়।'

রাতুল বললো, 'রবি যে বলছিলো, নদীর ওপারেই সুন্দরবন?'

'ঠিক ওপারে নয়।' নবু মৃদু হেসে বললো, 'এখান থেকে নৌকায় এক ঘন্টা ভাটির দিকে যেতে হবে।'

রাতুল বুঝলো, রবির একটু বাড়িয়ে কথা বলার স্বভাব আছে। বললো, 'ওদের রাজবাড়িটা কি নদী থেকে দেখা যায়?'

'এখনো কিছুটা যায়।' মাথা নেড়ে সায় জানালো নবু।' শুনেছি যখন ওটা বানানো হয়, তখন নাকি নদীর ওপরই ছিলো।'

'একবার যাবে ওখানে?'

নবু মুখ টিপে হেসে বললো, 'ভয় পাবে না তো!'

'কেন, কিসের ভয়!'

'রবি তোমাকে বলে নি জ্বীন থাকে ও-বাড়িতে!'

'তুমি জ্বীন-ভূত বিশ্বাস করো?'

নবু আগের মতো হেসে বললো, 'আল্লাকে যখন মানি, জ্বীন অবিশ্বাস করি কি করে! জ্বীনের কথা কোরানেও আছে।'

'তুমি কি মনে করো রাজবাড়িতে জ্বীন আছে?'

'আমি কখনো কিছু দেখি নি। কয়েকবার গিয়েছিলাম ওদিকটায়।'

'নৌকা নিয়ে চলো না, গিয়ে দেখি।'

'ওদিকেই যাচ্ছি। তবে নামতে পারবে না। নদীর ধারটায় অসম্ভব কাঁটাঝোপ। সাপের ভয়ানক উৎপাত।'

'রবি তো বলে ওগুলো সাপ নয়, জ্বীন। জ্বীনরা নাকি সাপের চেহারা ধরে রাজবাড়িতে থাকে।'

'লোকজন ওরকমই বলে। তবে যে যাই বলুক, সাপের জাতটাকে আমি বিশ্বাস করি না। গত বর্ষায় দুটো গোখারো মেরেছি।'

'তুমি কি কোনো কিছুকেই ভয় পাও না নবু?'

'কে বললে পাই না?' হেসে নবু বললো, 'অঙ্ক ভীষণ ভয় পাই। অঙ্কের স্যারকে আরো বেশি।'

নবুর কথার ধরন দেখে রাতুলও হো হো করে হেসে উঠলো। নদীর তীরে কাদার মধ্যে কয়েকটা বক একপায়ে দাঁড়িয়ে মাছ ধরার ধ্যানে মগ্ন ছিলো। ওদের হাসির শব্দে ওগুলো ঝটপট ডানা মেলে উড়ে গেলো। রাতুল মুগ্ধ চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

একটু পরে নবু বললো, 'রাজবাড়ি দেখতে পাচ্ছো? বাঁ দিকের তালগাছগুলোর ওপাশে দেখো।'

ঘন গাছগাছালির জন্য ভালোমতো দেখা যাচ্ছিলো না। আট-দশটা তাল গাছ খুব কাছাকাছি বেড়ে উঠেছে। সেগুলোর ডানপাশ দিয়ে যাতোটুকু দেখা গেলো, সেটাকে রাজবাড়ি না বলে কোনো প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ বলা ভালো।

নবু বললো, 'দক্ষিণ পাশটা একেবারেই ধসে গেছে। উত্তর দিকের অংশে ওপরে নিচে কয়েকটা ঘর এখনো অক্ষত আছে।'

বাড়ি থেকে বেরিয়েছে প্রায় দেড়ঘন্টার মতো হবে। রাতুল বললো, 'এবার নৌকা ফেরাও নবু। বাড়ি যেতে যেতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।'

দুপুরবেলা বেরিয়েছিলো বলে ওরা কেউ গরম কাপড় আনে নি। আকাশে রোদ থাকলেও নদীর কনকনে বাতাসে বেশ শীত করছিলো। নৌকো খালে ঢুকিয়ে নবু বললো, 'কিছুক্ষণ বৈঠা বাও, শীত লাগবে না।'

নবু একটা বৈঠা হালের মতো ধরে রইলো। রাতুল বৈঠা বাইলো। আধঘন্টার মধ্যে শীত কোথায় পালালো! রীতিমতো ঘেমে উঠলো রাতুল। নবু বললো, 'বৈঠা মারার কায়দা রপ্ত করতে আরে ক'দিন লাগবে।'

সূর্য ডোবার আগেই ওরা বাড়ি ফিরলো। তবু নাদুখালার বকুনি খেতে হলো—গরম কাপড় নিয়ে বেরোয় নি বলে। নবুকে বললেন, 'জানি, তোকে আজরাইলে নেবে না। শহরের কচি ছেলেটাকে কেন ঠাণ্ডার ভেতর তোর মতো সূতির জামা একটা পরিয়ে ঘোরাতে নিলি?'

রাতুল বললো, 'আমার একটুও শীত করছে না নাদুখালা।'

'তা তো বলবেই। নবুর পাল্লায় যখন পড়েছো তখন খালিগায়ে থাকলেও শীত করবে না। মুখ-হাত ধুয়ে ওপরে যাও। তোমাদের চা-নাশতা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বেনুদারা নেই। সন্ধ্যে না হতেই সদর দরজায় খিল পড়েছে। রাতুলকে বেনুদার মা আর নাদুখালা বারবার বলে দিয়েছেন সন্ধ্যের পর মুহূর্তের জন্যেও একা যেন বাড়ির বাইরে না যায়। এমনকি খিড়কির পুকুর ধারে যাওয়াও বারণ। আবেদালি ঘরে ঘরে দুটো করে হারিকেন জ্বেলে দিয়েছে। নিচে ছোড়দিকে দেখার জন্য রবিদের কোন আত্মীয়-কুটুম্ব এসেছে। বাড়িটা বেশ ভরা ভরা লাগছিলো, যদিও ওপরে ওরা দু'জন মাত্র। রাতে অবশ্য সিঁড়ির পাশের ঘরে আবেদালি আর কামলা সালাম থাকে। রাতুলের যদি কিছু দরকার হয় তাই এই ব্যবস্থা। নইলে আবেদালিও নিচে থাকে।

খাওয়ার জন্য শুধু রাতুলদের নিচে নামতে হয়। সেদিন রাতে ওরা তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘরে এসে ভারি লেপের তলায় ঢুকলো। হঠাৎ করে শীত বেড়ে গেছে। রাতুল বললো, 'সাইবেরিয়া থেকে আসছে এই বাতাস।'

নবু বললো, 'মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে জাহাজে করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে অজানা সব দেশে ঘুরি।'

রাতুল বললো, 'কি আশ্চর্য, আমারও তো তাই ইচ্ছে করে! রবি তো বলেছে বড় হলে ও জাহাজের ক্যাপ্টেন হবে।

নবু গম্ভীর হয়ে বললো, 'না না, রবির জাহাজে ওঠা যাবে না। ও যা ভীতু! নির্ঘাত আমাদের ডুবিয়ে মারবে।'

রাতুল ওর কথা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়লো।

বেনুদারা যে দু'দিন বরিশাল ছিলো, সময় যে কিভাবে হুট করে ফুরিয়ে গেলো রাতুল টেরই পেলো না। পরদিন নবু ওকে নিকেরিপাড়ায় নিয়ে

গিয়েছিলো। নবুর সঙ্গে রাতুলকে দেখে ওরা ভারি খুশি। রাতুল ওদের মাছ ধরা দেখলো। আসার সময় বড়বাড়ির কুটুম্বের জন্য জোর করে মস্তবড় এক ভেটকি মাছ দিয়ে দিলো। মাছ দেখে নাদুখালাও খুশি।

এর পরদিন বিকেলে এলো রবি আর বেনুদা। রবি মহা উত্তেজিত—কাকাদের বাড়িতে ছেলেমেয়েরা সবাই নাকি নাটক করেছে। বললো, 'ভাবী এসেছে শুনে সবাই বেনুদাকে ধরেছে সামনের সপ্তায় লঞ্চ রিজার্ভ করে আসবে। এখানে এসে নাটক দেখাবে।'

এতোবড় উত্তেজনার খবর শুনে রাতুল মোটেই উত্তেজিত হলো না। রবির মান রাখার জন্য শুধু বললো, 'তোর জন্য পার্ট রাখবে না?'

শুনে রবি আরো উত্তেজিত—'আমার পার্ট আমি লিখে নিয়ে এসেছি। কলকাতা থেকে মেজকাকার ছেলে মণিদা ডি এল রায়ের শাহজাহান নাটক এনেছে। ওটাই করা হবে।'

নবু বললো, 'ওসব হচ্ছে বড়লোকী নাটক। গত শীতে আমরা আমাদের স্কুলে শরৎচন্দ্রের মহেশ করেছিলাম।'

রবি টিটকিরি মেরে বললো, 'মহেশের পার্ট নিশ্চয়ই তুই করেছিলি?'

নবু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'কি যা তা বলছিস! আমাদের বাংলার স্যার ওই গল্পটাকে নাটক বানাতে গিয়ে অনেক বাড়িয়েছিলেন। আমি করেছিলাম কারখানার শ্রমিকের পার্ট।'

'মণিদাদের নাটক দেখলে তোর চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছ দেখা যাবে,' বলে মুখ টিপে হেসে নবু নিচে নেমে গেলো।

গত দু'দিনে রাতুল আর নবুর অদ্ভুত্ব কতো গভীর হয়েছে, রাতে টের পেলো রবি। ও যখন ছিলো না, তখন নবু ওপরে রাতুলের সঙ্গে থেকেছে, এমনিতে নবু নিচে থাকে। খেয়ে উঠে ওরা তিনজন রবির ঘরে এসে বসলো আড্ডা দেয়ার জন্য। রবি ভেবেছিলো শোয়ার সময় হলে নবু নিচে চলে যাবে। তার আগে রাতুল ওকে বললো, 'রবি, নবু আমাদের সঙ্গে থাকুক না। এতোবড় খাট, চারজনও শুতে পারবে।'

রবি মনে মনে বিরক্ত হলেও বললো, 'থাক না, অসুবিধে কি! তবে নাদুখালা নিচে একা থাকবেন।'

নবু বললো, 'মাকে তাহলে বলে আসি। আমি যখন তোকে পাহারা দেয়ার জন্য ওপরে থাকি, তখন যে পুষ্প বুজি মা'র কাছে থাকে, ভুলে গেছিস বুঝি!'

নবু আসার সময় ওর লেপ নিয়ে এলো। রবি বললো, 'জানালা খোলা থাকলে আমি ঘুমোতে পারবো না। নবু, জানালা বন্ধ করে দে।'

গত দু'দিন রাতুল জানালা খুলে শুয়েছিলো। রবির কথা শুনে নবু রাতুলের দিকে তাকালো। রাতুল বললো, 'ঠিক আছে, বন্ধ করে দাও। রবির যখন এতো

ভয়, কি করা যাবে।'

রবি বললো, 'কাল থেকে কেমন শীত পড়েছে টের পাচ্ছিস না?'

নবু জানালা বন্ধ করে খাটের এক কিনারে এসে শুলো। মাঝখানে শুলো রাতুল। হঠাৎ ওর মনে পড়লো, রবি যে রাজবাড়ির গুপ্তধনের কথা বলেছিলো, সে কথা নবুকে বলা হয় নি। এ দু'দিন একবারও মনে হয় নি কথাটা। নবুকে বললো, 'রাতে কখনো পুরোনো গোরস্থানে গিয়েছো?'

নবু বললো, 'রাতে যাবার কথা কখনো ভাবি নি। তবে দিনে অনেক গেছি। শেয়াল আর ভাম ছাড়া কিছু দেখি নি।'

রবি বললো, 'নাদুখালা যে বলে তোর দাদা ভূত দেখেছিলো?'

'দাদা রাতে এমনিতেই চোখে কম দেখতো।' নবু বললো, 'চোর-ছ্যাঁচড় কিছু দেখেছিলো হয়তো।'

রাতুল আবার নবুকে প্রশ্ন করলো, 'কখনো রাজবাড়ি গিয়েছো?'

'ভেতরে ঢুকি নি। বাইরে থেকে দেখেছি। একেবারেই জঙ্গল হয়ে গেছে জায়গাটা। এতোটুকু পা ফেলার জায়গা নেই।'

'আমার কিন্তু যাওয়ার ইচ্ছে করছে!'

'কেন বল তো?'

'রবি বলছিলো ও-বাড়িতে খুঁজলে নাকি গুপ্তধন পাওয়া যাবে। ওদের পূর্বপুরুষেরা নাকি পুঁতে রেখে গেছে।'

রবি শুকনো গলায় বললো, 'আসলে পুঁতে যেমন রেখেছে, তেমনি ওদের পোষা জ্বীনরা বসে বসে পাহারাও দিচ্ছে। আমাদের এক পূর্বপুরুষ তান্ত্রিকের পাল্লায় পড়ে একটা ছেলেকে মেরে যখ বানিয়েছিলো দেয়ালের ভেতর লুকানো মোহরর ঘড়া পাহারা দেয়ার জন্য। কেন, নবু শুনিস নি?'

নবু হাই তুলে বললো, 'যখের কথা জানি না। তবে পুরোনো জমিদার বাড়িতে ওসব থাকাটা বিচিত্র কিছু নয়। তার ওপর তোরা আবার ডাকাতের বংশ।'

রাতুল ওদের ঝগড়া থামানোর জন্য বললো, 'যাই বলো নবু, আমার কিন্তু পুরোনো রাজবাড়িটা দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।'

ওরা তিনজন টেরও পায় নি কখন আবেদালি ওদের জন্য তিনগ্লাস দুধ এনে দাঁড়িয়ে আছে। নাদুখালা নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, রোজ শোয়ার আগে সবাইকে একগ্লাস করে দুধ খেতে হবে। রাতুলের কথা শেষ হতেই টেবিলের ওপর ঠকাস করে দুধের গ্লাসের ট্রে নামিয়ে রেখে আর্তনাদ করে উঠলো আবেদালি—'রাতুল দাদা, আপনে কও কি? রাজবাড়িতে কোনো মানুষ যাইতে পারেহ্।'

সমর্থন পেয়ে রবি তড়বড় করে বললো, 'আমিও তো তাই বলি আবেদালি। ওখানে যে যখ আছে এ কথা কে না জানে!'

নবু গম্ভীর হয়ে বললো, 'শুধু যখ কেন, আরো অনেক কিছু থাকতে পারে।'

আবেদালি ভয়-পাওয়া শুকনো গলায় বললো, 'তোমরা গেরামের মানুষ। তোমরা ঠিহিই বুইজবে। রাতুল দাদারে বুজায়ে কও। শেষে কোলাম জানডা খোয়াইতে হইবেহেনে।'

রাতুল বুঝলো কথা বাড়তে দিলে এটা গোটা বাড়িতে মস্ত আলোচনার বিষয় হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি বললো, 'বোঝাতে হবে না আবেদালি। আমি এমনি ঠাট্টা করছিলাম। আমার কি জানের ভয় নেই? ভূত না হোক সাপখোপ তো কম নেই। কে যাবে ওর ভেতর মরতে। তার চেয়ে তুমি বরং আমাদের মাছের চার বানিয়ে দিও। কাল সকালে আমরা মাছ ধরবো। বিকেলে নৌকা বাইবো।'

'হেয়া ওইবে নে। তয় কতা ওইলো তেনাগো নিয়া মশকরা হরণ ভালো না।' এই বলে আশ্বস্ত হয়ে চলে গেলো আবেদালি।

ওকে কাটাতে পেরে রাতুল খুব খুশি। নবু আস্তে করে ওকে চিমটি কেটে গোপনে জানিয়ে দিলো, রাতুল ভালো বলেছে।

রবি বললো, 'জানিস, আমাদের মসজিদের হুজুরও জ্বীন দেখেছেন। একদিন মাগরেবের নামাজের সময় ওজু করে তিনি মসজিদে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখেন পুরোনো গোরস্থানের ভেতর দুটো লোক হাঁটছে। নবুর দাদার কথা হুজুরের জানা ছিলো। তাই তিনি আর ওদের পেছনে যান নি। হঠাৎ ওর চোখের সামনেই ভোজবাজির মতো লোক দুটো বাতাসে মিলিয়ে গেলো। একটু পর শোনেন ফোঁস ফোঁস শব্দ। তাকিয়ে দেখেন দুটো সাপ তাঁর দিকেই আসছে। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছেন।'

রাতুল মুখ টিপে হেসে বললো, 'তোদের এই ভয়-পাওয়াদের দলে একখানা হুজুরও আছে তাহলে? তবে আর কি, জুজুর ভয়ে গর্তে লুকিয়ে থাক।'

রাতুলের টিটকিরি শুনে রেগে গেলো রবি—'সাহস থাকে তো যা না। ভালোর জন্য বলছি—শুধু শুধু ইয়ার্কি!' এই বলে ও পাশ ফিরে শুলো।

একটু পরেই রবি ঘুমিয়ে গেলো। নবু ফিসফিস করে রাতুলকে ডাকলো, 'রাতুল, ঘুমিয়ে পড়েছো'?

রাতুল বললো, 'না'।

'চলো, বাইরে গিয়ে বসি।' বলে উঠে বসলো নবু।

দু'জন দুটো নরোম কাঁথা গায়ে জড়িয়ে বারান্দায় এসে বসলো। নবু একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'রবিকে আর মানুষ করা গেলো না। এতো ভয় নিয়ে ও কি করে যে সংসারে চলবে, ভেবে পাই না।'

রাতুল বললো, 'বেনুদা পাস করা ডাক্তার হয়ে যদি জ্বীনভূত বিশ্বাস করে, রবির কি দোষ বলো?'

'বিশ্বাসের সঙ্গে ভয়ের কি সম্পর্ক? জ্বীন তো আমিও বিশ্বাস করি। তাই বলে

ওদের মতো ভয় পাই নাকি!'

'তুমি কখনো জ্বীনভূতের পাল্লায় পড়েছিলে?'

'একেবারে পড়ি নি বলাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।' একটু ভেবে বললো নবু—'গত বর্ষায় একটা মেয়েকে জব্দ করার জন্য খিড়কি পুকুরে নেমেছিলাম। ভেবেছিলাম ডুব-সাঁতার দিয়ে ঘাটে এসে ওকে ভয় দেখাবো। সাঁতার যে আমি ভালো পারি সে তো দেখেছো। পুকুরের মাঝামাঝি এসেছি, হঠাৎ মনে হলো পা'টা কে টেনে ধরেছে। যতো ছাড়াতে যাই, আর ছাড়ে না, টেনে নিচের দিকে নিয়ে যেতে চায়। আমি জানি, মাথা গরম করলেই বিপদ। মনে মনে তিনবার কুলহুয়াল্লা পড়ে উল্টো দিকে সাঁতার দিতেই পা'টা ছুটে গেলো। এ কথা কাউকে বলি নি। মেয়েটাও জানে না।'

রাতুল রহস্যভরা গলায় বললো, 'মেয়েটা কে জানতে পারি?'

নবু লজ্জা পেলো—'না, মানে-পুষ্প বুজির ননদ। নাম হচ্ছে পারুল। পাশের গ্রামে থাকে। ক্লাস এইটে পড়ে। ভালো গান জানে। আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলো। সেবারই প্রথম আলাপ।'

'তারপর নিশ্চয়ই আরো কয়েকবার ওদের বাড়ি গেছো!' রাতুলের গলায় তখনো রহস্যের ছোঁয়া।

নবু হেসে ফেললো—'কি করে বুঝলে?'

'প্রথম আলাপে কি জানা যায়, কোন মেয়ে কি রকম গান গায়?'

'না, মানে—আসলেই ভালো মেয়েটা!'

'আহ, আমি কি বলেছি খারাপ! ছোড়দিকে দেখার জন্য নিশ্চয়ই আসবে?'

'আসবে না আবার! খালা তো দুনিয়ার যতো আত্মীয়-কুটুম্ব আছে সবাইকে দাওয়াত পাঠানো শুরু করেছে। আর মাত্র তিনদিন বাকি।'

'আমি তখন বলে দেবো তুমি ওকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলে।'

'ভালো হবে না বলছি।' রাতুলের পিঠে থাপ্পড় মেরে নবু বললো, 'তোমার মতলবটা কি শুনি?'

রাতুল নিরীহ গলায় বললো, 'আমার কোনো খারাপ মতলব নেই। তোমার পারুল তোমারই থাকবে। আমি ভাবছি অন্য কথা।'

'কি?'

'রবিকে একবার ভয় দেখালে কেমন হয়?'

'ও হার্টফেল করবে।'

'না, সে রকম সিরিয়াস কিছু নয়। ওর ভয় ভাঙাবার জন্য। ও যাতে বুঝতে পারে, চোখে দেখার ভুলে অনেকে অনেক কিছু দেখে।'

'ভালো বলেছো তো! তুমি কিছু ভেবেছো?' উৎসাহিত হয়ে উঠলো নবু।

'ভেবেছি।' বললো রাতুল।

বাইরে কুয়াশাভেজা ম্লান চাঁদের আলো। হু হু করে বইছে ঠাণ্ডা বাতাস। টানা বারান্দার এক কোণে কাঁথা গায়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে রাতুল নবুকে বললো ওর পরিকল্পনার কথা। ঘরের ভেতরে কিছুই টের পেলো না রবি।

ভয় দেখাতে গিয়ে ভয়ানক বিপদ

রাতুল আর নবু ঘুমিয়েছিলো অনেক রাতে। কতো যে কথা ওদের, কিছুতেই শেষ হতে চায় না। ঘুম ভাঙতেও দেরি হলো। ওদের গভীর ঘুম দেখে রবি আগেই উঠে নিচে চলে গেছে।

সকালের সূর্যের আলো যখন খোলা জানালা দিয়ে এসে রাতুলের চোখের পাতায় চুমো খেলো, তখন ওর ঘুম ভাঙলো। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখে সাড়ে ন'টা বাজে। হাই তুলে নবুকে ডাকলো, 'এই নবু উঠবে না! আর কতো ঘুমুবে?'

নবু চোখ মেলে তাকালো। রাতুলকে দেখে মৃদু হাসলো—'ঘুমোলাম কোথায়! শুয়েছি তো সাড়ে তিনটায়।'

'এখন সাড়ে ন'টা বাজে।'

'তাই নাকি!' লাফ দিয়ে উঠে বসলো নবু—'মা নির্ঘাত পিঠে খড়ম ভাঙবেন।' বলেই শর্টস পরে রোজকার মতো ব্যায়াম শুরু করলো।

রাতুল বিছানায় শুয়ে নবুর ব্যায়াম করা দেখতে দেখতে বললো, 'নাদুখালা সব সময় ওরকম বলেন।'

গুণে গুণে একশটা বুকডন আর পাঁচ শ' বার স্কিপিং করে ঘাম ঝরিয়ে নবু ব্যায়াম থামালো। ওর বুকের মাপ চল্লিশ ইঞ্চি, রাতুলের পঁয়ত্রিশ! স্কুলে রাতুল মাঝে মাঝে বাস্কেট বল আর টেবিল টেনিস খেলে। খেলার সময় কোথায় ওর! স্কুল ছুটির পর যতোক্ষণ ওদের লাইব্রেরি থাকে খোলা ততোক্ষণ মুখ গুঁজে বই পড়ে। লাইব্রেরি বন্ধ হওয়ার আগে ওটা শেষ করে নতুন আরেকটা বই ইস্যু করিয়ে বাড়ি ফেরে। একবারে একটার বেশি বই নেয়া যায় না। ওই একটাও দু'ঘন্টার ভেতর শেষ হয়ে যায়। তারপর রাতুলকে বাধ্য হয়ে পড়ার বই নিয়ে বসতে হয়।

নবু রাতুলের চোখে প্রশংসা দেখতে পেয়ে লজ্জা পেলো—'তোমারও ব্যায়াম করা উচিত রাতুল। এই শরীর নিয়ে এতো এ্যাডভেঞ্চার করবে কি করে? কাল রাতে তো কতো কি প্ল্যান করলে!'

রাতুল হেসে বললো, 'রবির চেয়ে অনেক শক্ত আছি। তুমি বরং ওকে গড়েপিটে মানুষ করার চেষ্টা করো।'

রবিদের বাড়িতে আসার পর থেকে রোজ দুপুরে এক ঘন্টা পুকুরে সাঁতার কেটে, বিকেলে নৌকা চালানো শিখতে গিয়ে-ব্যায়াম রাতুলেরও কম হচ্ছে না। শরীরের ভেতর শক্তি যে আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে এটা ও নিজেই বুঝতে পারে। নবু বললো, 'তোমার বডি-স্ট্রাকচার কিন্তু খুব সুন্দর। কয়েকটা ফ্রি হ্যাণ্ড শিখিয়ে দেবো তোমাকে, আরো সুন্দর হয়ে যাবে।'

রাতুল হাই তুলে বললো, 'কার জন্য সুন্দর হবো বলো! আমার তো আর পারুল নেই!'

'দেবো এক থাপ্পড়।' এই বকে নবু যেই হাত তুলেছে নিচের তলা থেকে তখনই হন্তদন্ত হয়ে রবি এসে হাজির।

'এতোক্ষণে তোদের ঘুম ভাঙলো! নিচে দারোগা এসেছে তদন্ত করতে। মা তোদের নাশতা নিয়ে বসে আছে। শিগগির আয়।' উত্তেজিত গলায় কথাগুলো বলে রবি যেভাবে এসেছিলো সেইভাবেই চলে গেলো।

নবু বললো, 'চুরি গেছে পনেরো দিন আগে, আজ এসেছে তদন্ত করতে। পুলিসের এই অকর্মা লোকগুলোকে দেখলে ইচ্ছে করে ওদের মুণ্ডু দিয়ে ফুটবল খলি।'

রাতুল হেসে বললো, 'তাহলে তোমাকে কয়েক শ' বছর আগে ইংল্যাণ্ডে জন্মাতে হতো!'

'কেন?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো নবু।

'চামড়ার ফুটবল আবিষ্কারের আগে ইংল্যাণ্ডে মড়ার খুলি দিয়ে ফুটবল খেলা হতো। শত্রুদের খুলি দিয়ে ওরা ফুটবল খেলতো।'

'এ কথা কখনো শুনি নি তো! তুমি জানলে কিভাবে?'

'বইয়ে পড়েছি। ফুটবল না খেললেও খেলার খোঁজখবর কিছু রাখি।' এই বলে রাতুল নবুকে তাড়া লাগালো, 'নাও উঠো এবার। ক্ষিদে পেয়েছে।'

মুখ-হাত ধুয়ে ওরা নিচে নেমে দেখলো, বৈঠকখানায় বসে মোটাসোটা দারোগা নিয়ম মাফিক জেরা করছে। টেবিলে বিস্তর খাবার। আবেদালি বিগলিত হয়ে- এটা খান, ওটা খান করছে। আর দারোগা খেতে খেতে হুঙ্কার ছাড়ছে—'বল তুই কোথায় ছিলি?'

দারোগার সামনে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে শুঁটকো লিকপিকে একটা লোক! নবু বললো, ওটা নাকি ধলাপাগলা। রাতে ওদের নিচের বারান্দায়

ঘুমোয়।

নাদুখালা মাথায় কাপড় টেনে একপাশে একটা চেয়ারে বসেছিলেন। এক সময় বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ও পাগল-ছাগল মানুষ, ওর ওপর এতো হম্বিতম্বি কেন বাছা! এ্যাদ্দিন পর এসেছো ভালোমন্দ যা কিছু আছে খেয়ে যাও। গয়না পেতে হলে পোদ্দার পাড়ায় নজর রাখো।'

নাদুখালার কথা দারোগার পছন্দ হলো না—'আপনি জানেন না খালা, এরা পাগল সেজে থাকে। আর এ্যাদ্দিন পর বলছেন বুঝি! চৌধুরীদের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে—গত এক মাসে যাবার সময় পেয়েছি! রোজ যদি এলাকায় একটা-দুটো খুন আর চার-পাঁচটা ডাকাতি হয়—কয় জায়গায় হাজিরা দেয়া যায় আপনিই বিবেচনা করুন।' এই বলে আবার ধলাপাগলাকে ধমক— 'বল তুই কোথায় ছিলি?'

নাদুখালা উঠে দাঁড়ালেন—'আমাকে যদি বিবেচনার ভার দাও তাহলে এমন কথা বলবো বাছা, তোমাদের একটুও পছন্দ হবে না। তাই বিবেচনার কথা আর বলছি না। জেরা-টেরা সেরে দুপুরে খেয়ে যেও। গয়না না পাই, তবু যে এসেছো একি কম ভাগ্য!'

দারোগা একগাল হেসে বললো, 'আপনি খালা মিছেমিছি রাগ করছেন। আমরা আপনাদের বাড়ির ছেলের মতো। যখন বলবেন তখনই খেতে বসবো। তবে চোর আপনাকে ঠিকই ধরে দেবো।' এরপর আবার ধলাপাগলাকে—'বল তুই কোথায় ছিলি?'

রাতুলের হাত ধরে ওকে পেছনের পুকুরঘাটে নিয়ে এলো নবু। বললো, 'নসু দারোগার বল তুই কোথায় ছিলি—শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। রবি বসে বসে ওর জেরা শুনুক। আমরা বরং বড়শি দিয়ে মাছ ধরি।'

মাছ ধরার ব্যাপারে রাতুলের উৎসাহের অন্ত নেই। দুপুর পর্যন্ত ওরা দু'জন মিলে গোটা তিরিশেক বড় বড় ট্যাংরা আর পাবদা ধরলো। নবু আড়াই সেরি একটা শোল মাছও ধরেছে। রবি তখনো বৈঠকখানায় বসে নসু দারোগার জেরা করা দেখছে।

বিকেলে রবিকে নিয়েই নৌকা নিয়ে বেরুতে হলো। আবেদালি আসে নি। ও গেছে এক কাঁদি ডাব আর দুটো কলার ছড়া নিয়ে দারোগার সঙ্গে, লঞ্চে তুলে দেবে বলে।

জেরা করে কিছু বের করতে না পেরে যাওয়ার সময় নসু দারোগা ধলাপাগলাকে কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গেছে। ও নাকি খুব ফেরোশাস টাইপের লোক। নাদুখালা অবশ্য পই পই করে বলে দিয়েছেন, 'যদি শুনি ধলাকে থানায় নিয়ে মারধার করেছো, আমি তোমার নামে কেস করবো।'

দারোগা রহস্য হেসে বলেছে, 'মারধোর করবো কেন! দেখবো শুধু ওর

জামিনের জন্য কারা আসে।'

নৌকা চালাতে চালাতে নবু বললো, 'নসু দারোগার তদন্ত করার বহর দেখেছো! দু'দিন পর মা আর খালার তাড়া খেয়ে বেনুদাই তো যাবেন ধলাপাগলাকে আনতে।'

রবি বললো, 'আমাদের মসজিদের হুজুর বলেছে, ধলাপাগলা নাকি জ্বীন দেখে পাগল হয়ে গেছে। এখনও নাকি ওর কাছে জ্বীনরা আসে। নসু দারোগা এবার টের পাবে মজাটা।'

রবির কথা শুনে রাতুলও মনে মনে হাসলো। রাতে রবিকে যে মজা টের পাওয়ানোর প্ল্যান ওরা করেছে সেটা যদি ও জানতো!' রাতুলের মনের খবর জানতে পেরে নবু ওকে চোখ টিপলো। হাসি চেপে রাতুল আকাশের দিকে তাকালো। রবি বললো, 'কতো বক দেখেছিস!'

রাতুল গম্ভীর হয়ে বললো, 'কে জানে ওগুলো সত্যি সত্যি বক কিনা। জ্বীনরা তো বকের ছবি ধরেও ওভাবে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে!'

রবি রাগতে গিয়ে হেসে ফেললো—'যখন ঘাড় ঘটকাবে তখন টের পাবি!'

রাতে যথারীতি বেনুদাদের আত্মীয়-স্বজনরা এসেছে নতুন বউ দেখার জন্য। গত ক'দিন ধরে রোজ এরকম হচ্ছে। ওদের ছেলেমেয়েদের চ্যাঁচামেচি, কাজের লোকদের ছুটোছুটি আর হাঁকডাকে বাড়ি জমজমাট। সবাই নিচের তলায় ব্যস্ত। রাতুল এক ফাঁকে রবিকে ডেকে বললো, 'সকালে মাছ ধরতে গিয়ে আমড়া গাছের তলায় কোথায় যেন আমার স্যাণ্ডেল জোড়া ফেলে এসেছি। চল না ভাই, আমার সঙ্গে খুঁজবি।'

রবি ওকে এড়াবার জন্য বললো, 'নবুকে নিয়ে যা না। বড় কাকার শ্বশুর বাড়ির লোকরা এসেছে। আমাকে ওদের কাছে থাকতে হবে যে!'

রাতুল বললো, 'নবু বিমলদের বাড়ি গেছে। তুই চল না! কতোক্ষণ আর লাগবে!'

'তাহলে আবেদালিকে ডেকে দি। আসলে রাতে আমি আমড়া তলায় যাবো না।' এই বলে রবি গেলো আবেদালিকে ডাকতে।

রাতুল মনে মনে প্রমাদ গুণলো। আবেদালি সঙ্গে থাকলেও রবি যদি না যায় তাহলে তো সব প্লান মাটি! ভাগ্য ভালো রাতুলের! আবেদালিকে অনেক ডাকাডাকি করেও কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না! নাদুখালা বললেন, 'ক'দিন ধরে দেখছি গরু তুলে আবেদালি কোথায় যেন আড্ডা মারতে যায়। আসুক আজ, ওর আড্ডা মারা বের করছি।'

রাতুল একটু বিরক্ত হয়ে রবিকে বললো, 'ঘর ভর্তি এতো লোক। তবু তুই ভয়ে সিঁটিয়ে আছিস! এতো যদি ভয় তাহলে আসার সময় আমাকে বারণ করলে পারতি! বেনুদাকে বলে কালই আমি চলে যাবো। থাক তুই তোদের জ্বীনভূত

নিয়ে। কাউকে কোথাও যেতে হবে না।'

রাতুল একবার রেগে গেলে সহজে যে ওর রাগ ভাঙানো যায় না—রবি খুব ভালো করেই জানে। আমতা আমতা করে বললো, 'আমি কি তাই বলছি! চল কোথায় যাবি। দাঁড়া, টর্চটা নিয়ে আসি।'

বেনুদার ঘর থেকে টর্চ এনে রবি এসে রাতুলের হাত ধরলো—'তুই মিছেমিছি রাগ করছিস। চল যাই।'

রবিদের বাড়ির খিড়কিপুকুরের কাছেই কয়েকটা আমড়া গাছ ঘন হয়ে বেড়ে উঠেছে। জোরে ডাকলে বাড়ি থেকে শোনা যায়। এটুকু পথ যেতে রবি শক্ত করে রাতুলের হাত আঁকড়ে ধরেছে। মনে মনে বেদম হাসছিলো রাতুল।

নবু আগে থেকেই একটা সাদা লুঙ্গি পরে, সাদা চাদরে গা মুড়ি দিয়ে আমড়া তলায় বসেছিলো। রবিই প্রথম দেখলো ওকে। দাঁড়িয়ে পড়ে ফিসফিস করে বললো, 'ভালো করে দেখ তো, সাদা মতো কি যেন দেখা যাচ্ছে ওখানটায়!'

রাতুল ভালো করে দেখার ভান করে বললো, 'কোথায় সাদা মতো কি দেখছিস? ওখানে কিছুই নেই।'

'আহ্, ভালো করে দেখ না! ওই গাছ দুটোর আড়ালে।'

'তোর চোখ খারাপ হয়েছে নাকি! সারাক্ষণ মাথায় ওসব ঘোরে—আমার স্যাণ্ডেল না খোঁজার ফন্দি খাটাচ্ছিস বুঝি! তখন বললেই পারতি! না, এখানে এসে যতো উল্টোপাল্টা কথা!'

রাতুলের কথা শুনে রবির ভয় আরো বেড়ে গেলো। ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, অথচ রাতুল দেখছে না— তার মানে ওসব না হয়ে যায় না। ওদের যে সবাই দেখতে পায় না এ কথা তো জানাই আছে। রাতুল অবিশ্বাসী বলে ওকে ওরা দেখা দিচ্ছে না। মনে মনে তিনবার কুলহুয়াল্লা পড়ে বুকে তিনবার ফু দিলো রবি। তারপর শুকনো গলায় রাতুলকে বললো, 'চল তাহলে।' ও ধরে নিলো কাছে গেলে বুঝি ওটা বাতাসে মিলিয়ে যাবে।

না, ওটার অদৃশ্য হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। রবির পা দুটো সিসার মতো ভারি মনে হলো। বুকের ভেতর কেউ যেন ধপধপ করে ঢেঁকি কুটছে। অথচ রাতুল নির্বিকার হেঁটে যাচ্ছে।

নবু আর রাতুল প্ল্যান করেছিলো, রবিকে এনে দেখাবে—কেউ ইচ্ছে করলে সারারাত বাগানের অন্ধকারে একা থাকতে পারে, ভয়ের কিছু নেই। আমাড়া গাছের কাছে এসে রাতুল যেই রবিকে বলতে যাবে—'দ্যাখ, কাকে দেখে তুই কি ভাবছিস...' তখনই নবু হাঁড়ির ভেতর মুখ নিয়ে খোনা গলায় বললো, 'এঁলে নাঁকি তোঁমরা! কঁতদিন মাঁনুষের রঁক্ত খাঁই নাঁ।'

নবু যে এমন শয়তানি করবে রাতুর ভাবতেই পারে নি। তাই ও নিজেও চমকে উঠলো। আর রবি সঙ্গে সঙ্গে টর্চ ফেলে দুই হাতে রাতুলকে জড়িয়ে

ধরে—'ও মা গো! বাবা গো, খেয়ে ফেললো গো!' বলে বিকট চিৎকার।

রবির এই চিৎকারের পরিণতির কথা ভেবে রাতুল ভয়ে কাঠ হয়ে গেলো। ওকে কোনো কথা বলার সুযোগই পেলো না।

চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতর থেকে সবাই হারিকেন হাতে—'কী হলো, কী হলো,' বলে ছুটে এলো। কারো হাতে লাঠিও। সবাই মিলে হাজারটা প্রশ্ন।

জবাবে রবি শুধু বললো, 'ভূত!' ওর চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

'কোথায়?'

রবি আমড়া গাছের দিকে আঙুল তুলে দেখালো। সবাই হারিকেন তুলে দেখলো, কোথাও কিছু নেই। রাতুলকে কে যেন প্রশ্ন করলো, 'ছোড বেআই, তুই দ্যাখছো?'

রাতুল ঢোক গিলে মাথা নাড়লো।

হঠাৎ একজন বললো, 'আমবাগানে দ্যাহো তো, কেডা জানি হাডে?'

'কোই, কোনহানে?' কোরাসে বললো সবাই।

দূরে আমবাগানে দেখা গেলো আবছা সাদা কি যেন একটা হেঁটে যাচ্ছে গোরস্থানের দিকে। একজন বললো, 'চোর-ডাহাইতে হইতে পারে। লও গিয়া দেহি!'

ভিড়ের ভেতর গুঞ্জন উঠলো। কেউ যেতে চায় না। পেছনে যারা ছিলো, তারা গুটি গুটি পায়ে বাড়ির দিকে গেলো। একজন বললো, 'নইমদ্দি, মোর লগে লও দেহি, কেডা?'

নইমুদ্দি চিঁচিঁ করে বললো, 'মোর কোমরে বাত। সালাইম্মারে লইয়া যাও।'

সালাম বললো, 'ক্যা সালাইম্মা ক্যা? মোর কি জানের ডর নাই?'

শেষ পর্যন্ত চারজন সাহসী লোক লাঠি হাতে হারিকেন নিয়ে আমবাগানে ঢুকলো। বাকি সব দাঁড়িয়ে রইল, পুকুরঘাটের পাশে। কিছুক্ষণ পর ওরা ফিরে এসে বললো, সাদা মতো ওটা নাকি রাজবাড়ির দিকে যেতে যেতে হঠাৎ বাতাস মিলিয়ে গেছে।

একথা শুনে কয়েকজন বিড়বিড় করে দোয়া-দরুদ পড়তে লাগলো। সবার সঙ্গে রাতুলকেও ঘরে ফিরতে হলো। নবু আমবাগানে রয়ে গেছে একথা ওর বুকের ভেতর খচমচ করতে লাগলো। রবির ওপর এতো রাগ হলো যে ওর সঙ্গে কথা বলতেই ইচ্ছে হচ্ছিলো না।

রাতে খাওয়ার সময়ও নবু এলো না। রাতুল মনে মনে হিসেব করলো দু'ঘন্টা পেরিয়ে গেছে। ওকে আর রবিকে খেতে দিয়ে নাদুখালা বললেন, 'নবু কোথায়?'

রবি বললো, 'বিমলদের বাড়ি গেছে।'

নাদুখালা বিরক্ত হলেন—'তবেই হয়েছে। ও বাড়িতে গেলে ওর আর ফেরার

কথা মনে থাকে না। তোমরা খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো গে। রাত অনেক হয়েছে।'

খাওয়ার পর রবিকে কিছু না বলেই রাতুল ওর ঘরে চলে এলো। একটা চেয়ার টেনে দক্ষিণের জানালার কাছে বসলো। খিড়কিপুকুরের পশ্চিমে আমবাগান, জানালা থেকে দেখা যায়। নবু নিশ্চয় এতোক্ষণে কোথাও চলে গেছে। রাতুলের রাগ হচ্ছিলো রবির ওপর। এভাবে না চ্যাঁচালেই কি চলতো না? ভয়ে যদি মূর্ছা যেতো তাহলেও রক্ষা ছিলো। তা নয়, ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাতে লাগলো! নবু ফিরে আসুক। রবিকে ভালোমতো জব্দ করতে হবে।

কিছুক্ষণ পর রবি এলো। রাতুলের চেহারা দেখে আগেই বুঝেছে, ও যে রাগ করে আছে। ততোক্ষণ খাটের ওপর চুপ করে বসে রইলো। মনে মনে চাইছিলো রাতুল কিছু বলুক। ওকে ওভাবে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে না পেরে বলেই ফেললো, 'তুই কি সত্যিই ভয় পেয়েছিস? আমি তো তোকে আগেই বলেছিলাম আমড়াতলায় কি যেন বসেছিলো। ওরা যে সত্যি সত্যিই আছে—কথা শুনে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেছিস! শুধু আমরা কেন, অন্য সবাইও তো দেখেছে।'

রাতুল ওকে ধমক দিয়ে বললো, 'বাজে বকিস না তো!'

রবি মাথা নিচু করে বসে রইলো। নাদুখালা ওদের জন্য দুধ নিয়ে এলেন। বললেন, 'তোমরা আর নবুর জন্য রাত জেগো না। বিমলদের বাড়ি গেলে ও অনেক সময় থেকে যায়। যেতে হয় পুরোনো গোরস্থানের পাশ দিয়ে। তাই ওকে বারবার বলে দিয়েছি বিমলদের বাড়ি রাত হয়ে গেলে ওখানে থেকে যাস। তোমরাও তো কি-সব দেখলে। না ফিরে ভালোই করেছে ছোঁড়া। দুধটুকু খেয়ে শুয়ে পড়ো।'

টেবিলে রাখা দুধ টেবিলেই পড়ে রইলো। রাতুল ফিরেও তাকালো না। রবি একবার বললো, 'দুধ খাচ্ছিস না? ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

রাতুল ওর কথার জবাব দিলো না। দেয়াল ঘড়িতে বারোটার ঘন্টা বাজলো। নবু এখনো এলো না—এই একটা কথাই সারাক্ষণ ওর মাথার ভেতর ঘুরছে। একবার ওর মনে হলো, নবুর কোনো বিপদ হয় নি তো! জ্বীন ভূতের কথা বাদ দিলেও সাপ-খোপের ভয় তো আছে! যদি ডাকাতের খপ্পরে পড়ে? অন্ধকার গোরস্থানে একা নবুও তো ভয় পেতে পারে? এসব কথা ভাবতে গিয়ে রাতুলের বুকের ভেতরটা শিরশির করতে লাগলো। চোখ জ্বালা করে কান্না এলো। কাল রাতে এই সময় ওরা দু'জন বারান্দায় বসে গল্প করছিলো। নবু ওর হাতে হাত রেখে বলছিলো, 'রাতুল ঢাকা গিয়ে আমাকে ভুলে যাবে না তো? রাতুল জবাব দিয়েছিলো, 'যতোদিন বেঁচে থাকবো, ততোদিন তোমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু থাকবো।' নবুকে পেয়ে রাতুলের মনে হয়েছে এতোদিন ওর মতো একজন বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলো ও। নবুর সঙ্গে পরিচয়ের আগে রবি ছিলো ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধু। মাত্র কয়েকদিনের ভেতর রবির কাছ থেকে ও দূরে সরে গেছে। বারবার

মনে হচ্ছে আর বুঝি কোনোদিন নবুকে দেখবে না। রাতুল টেরও পেলো না—চোখের পানিতে ওর গাল ভেসে যাচ্ছে।

রবি উঠে এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'রাতুল তোর মন খারাপ কেন? কি হয়েছে তোর, আমাকে বলবি না? তোর জন্য আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।'

কান্না সামলে রাতুল বললো, 'তোকে একট কথা বলবো। আগে বল কাউকে ঘুণাক্ষরেও বলবি না?'

রাতুলের কাঁধে হাত রেখে রবি বললো, 'তোর গা ছুঁয়ে বলছি, কাউকে কিছু বলবো না। কি হয়েছে বল।'

রাতুল আস্তে আস্তে বললো, 'আমড়াতলায় তুই যাকে ভূত ভেবেছিলি, ওটা ভূত নয়— নবু।'

'বলিস কি!' চমকে উঠলো রবি।

'হ্যাঁ রবি।'

'নবু তাহলে বিমলদের বাড়ি যায় নি?'

'না।'

'তোরা দু'জন মিলে আমাকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলি?'

'ভয় দেখাতে নয়, তোর ভয় ভাঙাতে চেয়েছিলাম। তুই যে চেঁচিয়ে এমন কাণ্ড বাঁধাবি কে জানতো।!'

'আমি কি জানতাম ওটা নবু! 'আমি তো সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছিলাম।'

বিরক্ত হয়ে রাতুল বললো, 'এবার তো ভয় ভেঙেছে। যা, ঘুমোতে যা।'

'তুই ঘুমোবি না?'

'আমি পরে ঘুমোবো।'

রবি কোনো কথা না বলে বিছানার ওপর থেকে একটা কাঁথা এনে রাতুলের গায়ে জড়িয়ে দিলো। খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে। রাতুলের গায়ে জামার ওপর পাতলা হাতকাটা একটা সুয়েটার মাত্র।

রবি ওর গায়ে কাঁথা জড়িয়ে দেয়ার পর রাতুল টের পেলো এতোক্ষণ খোলা জানালার পাশে বসে থেকে ওর হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এই শীতের ভেতর নবুর গায়ে কোনো সুয়েটার নেই, শুধু একটা খদ্দরের চাদর গায়ে দিয়ে বসেছিলো ও। কথাটা ভাবতে গিয়ে আবার কান্না পেলো রাতুলের।

রবি ওর কাছে একটা চেয়ার টেনে এসে বসলো। কিছুক্ষণ পর সমবেদনা ভরা গলায় বললো, 'তুই কি নবুর কথা ভাবছিস রাতুল?'

রবির মুখের দিকে তাকালো রাতুল। রবিকে আর দূরের মনে হলো না। রবি ঠিকই বুঝতে পেরেছে রাতুল কি ভাবছে।

রবি দেখলো রাতুলের দু'চোখে কান্নার দাগ। বললো, 'এতো ভাবছিস কেন রাতুল! নবু বুদ্ধিমান ছেলে। এতো গণ্ডগোল দেখে ও ইচ্ছে করেই বাড়ি ফেরে

নি। ও তো সত্যি সত্যি বিমলদের বাড়ি যেতে পারে।'

কথাটা রাতুলেরও মনে হয়েছিলো একবার। মনে মনে ভাবলো, রবির কথাই যেন সত্যি হয়। তারপর আবার মনে হলো, নবু বলেছিলো ফিরে এসে রবিকে বলবে, 'হানাবাড়ির অতৃপ্ত আত্মা কেমন দেখলি বল!' রবিকে নিয়ে রগড় করার এতোবড় একটা সুযোগ কি ও ছেড়ে দেবে? বললো 'ও বিমলদের বাড়ি যাবে একথা বলে নি।'

'হৈচৈ দেখে ঘাবড়ে গেছে নিশ্চয়ই। ধরা পড়লে ওর কি অবস্থা হতো ভেবে দেখেছিস?'

হতেও পারে। মনে মনে ভাবলো রাতুল। বললো, 'সকালের ভেতর নবু না ফিরলে আমি একাই তোদের হানাবাড়ি যাবো ওকে খুঁজতে।'

রবি কিছুক্ষণ হাত ধরে বসে রইলো। তারপর শান্ত গলায় বললো, 'তুই যদি একা যেতে পারিস আমিও তোর সঙ্গে যেতে পারবো।'

রবির কথা শুনে রাতুল কিছুটা হালকা বোধ করলো। দেয়াল ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজলো। রবি বললো, 'এবার শুতে চল রাতুল।'

বিপদের বেড়াজালে আটকে পড়ছে নবু

আমড়াতলায় রবির মরণ চিৎকার শুনেই নবুর মনে হয়েছিলো মাটির হাঁড়ির ভেতর মুখ ঢুকিয়ে বিকট শব্দে কথা বলাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আসলে এটা ওদের প্ল্যানের ভেতরও ছিলো না। তবে ঘটনা যা ঘটার ছিলো ঘটে গেছে। এরপর পালানো ছাড়া আর কোনো পথ সামনে খোলা নেই। নবুকে সেই পথই নিতে হলো। রবিকে বলার সময়ও পেলো না, ও যে মিছেমিছি ভয় পেয়েছে।

আমবাগানের ভেতর দিয়ে হেঁটেই যাচ্ছিলো নবু। প্রথমে ভেবেছিলো ওর পেছনে আসার সাহস কারো হবে না। আমবাগান পেরিয়ে পুরোনো গোরস্থানে ঢুকতেই পেছনে দেখলো চার-পাঁচজন লোক ওর দিকে আসছে। আর ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না ভেবে দৌড় লাগালো নবু।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে পুরোনো গোরস্থান। গাছপালা বেশ ফাঁকা ফাঁকা।

মানুষ সমান ছনঘাসে ঢাকা। পৌষ মাসের শেষে ছন শুকিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। ভয়ে কেউ কাটতেও আসে না। কোথায় রাস্তা, কোথায় কবর অন্ধকারে কিছু ঠাহর হচ্ছিলো না নবুর।

গোরস্থানের ভেতর দৌড়ে পালাতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হলো ও কোন দিকে যাচ্ছে? তখনো চাঁদ না উঠলেও পৌষের পরিষ্কার আকাশে ছিলো লক্ষ তারার মেলা। নবু তারার ফ্যাকেসে আলোয় দেখলো ও রাজবাড়ির দিকে দৌড়াচ্ছে। চমকে উঠলো সে। এদিকে তো যাওয়ার কথা নয়। বিমলদের বাড়ির উল্টো দিকে। মনে হলো যেন ও নিজে থেকে যাচ্ছে না, কোনো অদৃশ্য শক্তি ওকে টানছে কয়েক শ' বছরের পুরোনো অভিশপ্ত বাড়িটার ধ্বংসস্তুপের দিকে। নবুর মনের ভেতর কে যেন বললো, 'ওদিকে যেও না। বিপদ আছে।'

নবু জানে বিপদে পড়লে সবার আগে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। প্রথমে থমকে দাঁড়ালো ও। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে চাইলো, এখন কি করবে। ঠিক তখনই নবু শুনলো, ভেতর থেকে আবার যেন ওকে কেউ বলছে, 'এখানে দাঁড়াবে না, পালিয়ে যাও।'

প্রথমে নবু ঠিক করলো বিমলদের বাড়ির দিকে যাবে। পরে ভাবলো যা হবার হবে ওদের বাড়িতেই ফিরে যাবে। রান্নাঘর দিয়ে ঢুকলে কেউ টেরও পাবে না। একথা ভেবে যেই ডানদিকে ঘুরতে যাবে অমনি চারপাশ থেকে সাদা কুয়াশা এসে ওকে ঘিরে ধরলো। ভীষণ অবাক হলো নবু। এতোক্ষণ আকাশ ছিলো পরিষ্কার। কুয়াশা ছিলো খুবই হালকা। হঠাৎ কুয়াশা এতো ঘন হয়ে গেলো কি করে? শুধু কুয়াশা নয়, যেন ঠাণ্ডা বাতাস বরফের মতো জমাট বেঁধে ওকে চেপে ধরতে চাইছে। মনে হলো ঠাণ্ডায় জমে যাবে ও। কুয়াশা এতো ঘন যে নিজের হাত-পা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশার সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের ভেতর ভয়ও জমতে লাগলো। এখান থেকে কি কখনো বেরুতে পারবে না? নবু আবার অনুভব করলো সেই অদৃশ্য শক্তি ওকে হানাবাড়ির দিকে টানছে।

না, হতে পারে না। মনের ভেতরে সাহস আনলো নবু। রাতুল ওর জন্য অপেক্ষা করছে। ও ফিরে না গেলে রাতুলের ঘুম হবে না। রবির ভয় ভাঙবে না। এই রাতে একা হানাবাড়িতে ও যাবে না। মনে মনে বললো, 'আমি তোমাদের ভয় পাই না। এখন আমি বড়ি ফিরে যাবো।'

নবু পেছন ফিরে এক পা দু'পা করে বাড়ির দিকে এগোতে গিয়ে অনুভব করলো, ওর পা দুটো এত ভারি মনে হচ্ছে যে কোনদিনই বাড়ি ফিরতে পারবে না। নিয়মিত ফুটবল খেলে নবু। একবার মনে হলো বেমক্কা দৌড়াতে গিয়ে মাসল পুল হয়েছে। খেলার সময় মাঝে মাঝে এরকম হয়। ভাবলো আর দৌড়ে কাজ নেই, হেঁটেই যাবে, ঘরে গিয়ে একটু ম্যাসেজ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো এটা মাসল পুল নয়। সেরকম হলে ব্যথা লাগতো।

ওর পায়ে কোনো ব্যথা নেই। তবে পা দুটো ঠিক নিজের মনে হচ্ছে না। যেন অন্য কারো পায়ের উপর ভর দিয়ে হাঁটছে ও।

'বাড়ি ফিরে যেতেই হবে।' মনে জোর আনার জন্য দাঁতে দাঁত চেপে বললো নবু। আরো কয়েক পা এগোলো। মাটিতে শোয়া শুকনো ছন আর কাঁটাঝোপের জন্য হাঁটতে আরো অসুবিধে হচ্ছে। তখনো কুয়াশার দেয়াল ওকে ঘিরে রেখেছে। পৃথিবীর কোনো শব্দ ওর কানে আসছে না। যেন অন্য কানো গ্রহে এসে পড়েছে ও।

প্রাণপণ শক্তিতে পা দুটোকে টেনে নিয়ে আরো দু'পা এগোলো নবু। তৃতীয়বার পা ফেলতে গিয়েই বুঝলো ভুল জায়গায় পা ফেলেছে। কিন্তু কিছুই করার নেই। কলজের ভেতরটা ধক করে উঠলো। পুরোনো কোন ভাঙা কবর হবে বোধ হয়। পা ফেলতেই কে যেন টেনে নিচে নিয়ে গেলো ওকে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালো ও।

যেটাকে পুরোনো কবর ভেবেছিলো ওটা আসলে ছিলো একটা পরিত্যক্ত কুয়ো। পানি বহু আগেই শুকিয়ে গেছে। তলায় শুকনো ঘাস পাতার স্তূপ জমাতে তেমন কোনো আঘাত লাগে নি ওর। কয়েক মিনিটের ভেতর ওর জ্ঞান ফিরলো। হাতের কনুই দুটো ঘষা লেগে ছড়ে গেছে। পড়ার সময় অবচেতন মনে গর্তের পাড় ধরতে গিয়ে এমনটি হয়েছে। কনুইতে চিনচিনে ব্যথা ছাড়া আর কোথাও কোনো ব্যথা নেই। মাথাটা শুধু ঝিমঝিম করছিলো।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হাত-পা নেড়ে দেখলো নবু, সব ঠিক আছে। ওপরে তাকিয়ে দেখলো আঠারো উনিশ হাত গভীর হবে গর্তটা। পড়ে যাওয়ার সময় ঘাস সরে যাওয়াতে গর্তের মুখের এক কোণে একটুখানি কালো আকাশ দেখা যাচ্ছিলো। চারপাশে হাতড়িয়ে দেখলো, গর্তের দেয়ালে ইটের গাঁথনি। বহুদিনের অব্যবহার ফাঁকে ফাঁকে ঝোপঝাড় গজিয়ে শুকিয়ে খড় হয়ে গেছে।

হঠাৎ নবুর খেয়াল হলো ওর জামার সাইড পকেটে দেয়াশলাই থাকার কথা। সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত দিয়ে দেখলো ওটা জায়গা মতোই আছে। বের করে একটা কাঠি জ্বালালো। হিসেব করে খরচ করতে হবে। মাত্র অল্প ক'টা কাঠি আছে।

দেয়াশলাইর আলোয় চারপাশের কয়েক হাত অন্ধকার কেটে গেলো। হাতে ছ্যাকা না লাগা পর্যন্ত জ্বলন্ত কাঠিটা ধরে রাখলো নবু। আবছা আলোয় দেখলো ওর বাঁ পাশে দেয়ালের গায়ে একটা সুড়ঙ্গের মতো চলে গেছে। কুয়োর মুখের চেয়ে সরু, মাথা নিচু করে ঢুকতে হবে। সুড়ঙ্গের মুখে পা রেখে আরেকটা কাঠি জ্বালালো নবু। সুড়ঙ্গের চারপাশে কুয়োর মতো ইটের গাঁথুনি। সম্মোহিতের মতো অদৃশ্য কোনো শক্তির আকর্ষণে নবু সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকে গেলো।

ভেতরে অন্ধকার নিরেট কালো পাথরের মতো। দেয়াশলাইর তৃতীয় কাঠিটা

নিভে যাওয়ার পর নবু ঠিক করলো আর কাঠি খরচ করবে না। সুড়ঙ্গের দেয়ালে এক হাত রেখে আরেক হাত সামনে বাড়িয়ে অন্ধকার ভেদ করে সে এগিয়ে চললো।

অনেক লম্বা সুড়ঙ্গ। প্রথম দিকে দেয়াল শুকনো ছিলো। মিনিট দশেক পর হাতে ভেজা ভেজা লাগলো। নবুর মনে হলো আস্তে আস্তে যেন ওপরের দিকে যাচ্ছে। আরো কিছুদূর যাওয়ার পর দেয়াল শেষ হলো। নবু চতুর্থবার দেয়াশলাই জ্বালালো। দেখলো, বাঁ দিকে সুড়ঙ্গের একটা শাখা চলে গেছে। সামনের অংশ আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠে গেছে। নবু বাঁ দিকে ঘুরলো। দেখলো এই অংশটা বেশ পরিষ্কার। আলো নিভে যাওয়ার পর আবার আগের মতো ঘোরের ভেতর সামনে এগিয়ে গেলো। তখন ওর নিজের বাড়ি-ঘর, রাতুল, রবি কারো কথাই মনে নেই। অদৃশ্য থেকে কে যেন নিঃশব্দে ওকে ডাকছে 'আয় আয়' বলে।

আরো মিনিট দশেক হাঁটার পর একটা পচা গন্ধ ওর নাকে এসে লাগলো। প্রথমে কম ছিলো, যতো সামনে এগোলো, গন্ধটা ততো বাড়তে লাগলো। শেষে এমন হলো যে দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইলো। নাকে চাদর চেপে কিছুটা পথ যাওয়ার পর আবার সুড়ঙ্গের দেয়াল শেষ হলো। নিঃশ্বাস বন্ধ করে নবু দেয়াশলাইর কাঠি জ্বালালো। বাঁ পাশে দেখলো একটা কুয়োর মতো, হাত দশেক ওপরে খোলা মুখ দিয়ে নক্ষত্রের আবছা আলো ভরা আকাশ দেখা যাচ্ছে। কুয়োর তলায় নজর পড়তেই নবুর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। সে এক বীভৎস দৃশ্য। দেয়াশলাইর কাঠিটা ওর অজান্তেই হাত থেকে পড়ে গেলো।

যতোটুকু দেখার এরই ভেতরে নবুর দেখা হয়ে গেছে। পাঁচ-ছ'হাত নিচে কুয়োর তলায় কয়েকটা মানুষের কঙ্কাল। দুটোর গায়ে এখনো এখনে—সেখানে মাংস লেগে আছে। কয়েকটা ছুঁচো আলোর আভাস পেয়ে চিকচিক করে ছুটোছুটি করতে লাগলো। আবার দেয়াশলাই জ্বালালো নবু। না, চেনার কোনো উপায় নেই। একটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়েছিলো। দেখে মনে হয় পাঁচ-ছ'মাস আগের ফেলা। সামনে তাকিয়ে দেখলো সুড়ঙ্গটা ডান দিকে মোড় নিয়েছে।

নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলো না। সেখানে বসেই হড়হড় করে বমি করে ফেললো নবু। তারপর নাক চেপে টলতে টলতে সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। দুর্গন্ধটা আস্তে আস্তে কমে এলেও নবুর মনে হলো নাকের ওপর থেকে চাদর সরালেই বুঝি ওটা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আচ্ছন্নের মতো আরো কিছুটা পথ যাওয়ার পর নবু হঠাৎ চমকে উঠলো। দূরে সুড়ঙ্গের দেয়ালে একা জ্বলন্ত হারিকেন ঝোলানো। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালো সে।

হারিকেন যেখানে ঝোলানো সেখানে সুড়ঙ্গটা দুটো শাখায় ভাগ হয়ে গেছে। ঝোলানো হারিকেনের একটাই অর্থ—কাছাকাছি মানুষ আছে। আর তারা যে খারাপ মানুষ, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'কারা থাকে এখানে?' মনে মনে প্রশ্ন করলো নবু। উত্তর পাওয়ার জন্য আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে গেলো। হারিকেনের কাছে এসে দেখলো বাঁ দিকের সুড়ঙ্গ অন্ধকার, ডান দিকে পনেরো হাত দূরে আরেকটা হারিকেন জ্বলছে। এবার কোন দিকে যাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবলো নবু। ওর নিজের উপস্থিতি ওদের টের পেতে দেবে না। তবে এখান থেকে বেরুবার আগে জানতে হবে এরা কারা! নবু মাথার ওপর ঝোলানো হারিকেনটা আস্তে নিভিয়ে দিলো। দূরের অন্ধকার থেকে কেউ ওকে দেখে ফেলতে পারে। এতোক্ষণ যেরকম ঘোরের ভেতর ছিলো সেটা কেটে গেছে ওর। উত্তেজনায় বুকটা ঢিবঢিব করছে। পা টিপে টিপে ডান দিকের সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলো নবু।

হারিকেন ওপরে ঝোলানো থাকায় ওটার তলায় অন্ধকার ছিলো। আলোর কাছাকাছি এসে নবু মাথা নিচু করে হাঁটলো যেন ওর গায়ে আলো না পড়ে। দ্বিতীয় হারিকেনের তলায় এসে সেটাও নিভিয়ে ফেললো।

এরপর সুড়ঙ্গ আবার ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। তবে এখন আর ওটাকে সুড়ঙ্গ বলা যাবে না। দু'পাশে দেয়াল, ওপরে ছাদ। দেয়ালের আস্তর খসে ইট বেরিয়ে পড়লেও সেখানে ঝোপঝাড় গজায় নি। নিয়মিত লোকজন চলাফেরা করলে যা হয়।

কিছুদূর যেতেই মানুষের গলা শোনা গেলো। নিঃশব্দে সেদিকে এগিয়ে গেলো নবু। বাঁ পাশে একটা ঘরের ভেতর থেকে কথা আসছে, ঘরে দরজা ভেজানো। ফাঁক দিয়ে ভেতরের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে। বেশ বড় ঘর। চার-পাঁচজন লোক বসে আছে হারিকেনের চারপাশে। পরনের কাপড়-চোপড় দেখে মনে হয় কামলা-টামলা হবে। এ গাঁয়ের বা আশেপাশের কেউ নয়। কাছাকাছি দু'চার গাঁয়ের সব মানুষকে নবু চেনে।

একজন বললো, 'যাই কও ব্যাডা, পনেরো টাহায় পোষায় না। চাইলের স্যার পাঁচ টাহা, ছয় টাহা—।'

আরেকজন বললো, 'দুবলার চরের হ্যারাই ভাল আছে। দশখান হরিণ মারলে কয় নয়খান মারছি। একখান নিজেগো মইদ্যে ভাগ কইরা লয়।'

'খালি হরিণ কও ক্যা।' আরেকজন বললো, 'গত বছর বাঘ মারছেলে ছয়হান, হ্যারা কইছে পাঁচহান। একহান বাঘের চামড়া জায়গামতো বেচতে পারলে দশ হাজার টাহা।'

প্রথমজন বিরক্ত হয়ে বললো, 'মোগো আর কততখন বআইয়া রাখপে! অ ভাইডি দ্যাহ না, বর মেঞায় কয় কি?'

যাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলা হলো সে খেঁকিয়ে উঠলো, 'ক্যা, মোরে যাইতে কও ক্যা? গাইলমন্দ ব্যাবাক মুই এ্যাল্লা খামু? হাউশ হয় নিজে যাও।'

পেছনের দরজা দিয়ে ভারিক্কি চেহারার একজন ঢুকে ধমকের গলায় বললো, 'এ্যাতো চিল্লাচিল্লি কিয়ের হুনি? ক্যাঠায় চিল্লায়?'

প্রথমজন কাঁচুমাচু করে বললো, 'না ছোডমেঞা, রোস্তইম্যায় কয়, কামে কহন যাওন লাগবে—আবার না দেরি ওইয়া যায়—'

'যেসুম কমু হেসুম যাবি। চিল্লাবি না। কাকায় চিল্লানি হুনলে তগোরে দিয়া কুমির খিলাইবো। জানস না কাকার হাটের বিমারি আছে?'

যে জোরে কথা বলছিলো সে মিনমিন করে বললো, 'মুই তো হেইয়াই কইতে গেছি—'

'খামুস মাইরা বইয়া থাক।' এই বলে সর্দার গোছের লোকটা চলে গেলো।

নবু বুঝতে পারলো এটা ছোট সর্দার। ওর ওপরও কাকা নামের একজন আছে। ওদের কাজটা কি শুধু লুকিয়ে সুন্দরবনের বাঘ হরিণ মারা? নাকি অন্য কিছু? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে কাকার কথাবার্তা শোনা দরকার। কিন্তু কিভাবে যাবে সেখানে?

এ নিয়ে নবুকে বেশিক্ষণ ভাবতে হলো না। চুপিসারে দু'জন মুষকো জোয়ান কখন ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে—ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি। লোহার মতো শক্ত দুটো হাত যখন নবুর দু'হাত চেপে ধরলো তখন চমকে উঠে ঝটকা মেরে ছাড়াতে গিয়েছিলো, কিন্তু ওর মতো শক্তিশালী ছেলেও লোক দুটোকে একচুল নড়াতে পারলো না। একজন বললো, 'আবে রোস্তইম্যা, হেরিকেনটা আন তো। চিড়িয়া ধরচি।'

গলা শুনে নবু বুঝলো একটু আগে এই লোকই ঘরে ওদের ধমকাচ্ছিলো।

রোস্তম হারিকেন হাতে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। উঁচু করে ধরলো নবুর মুখের ওপর। অবাক হয়ে বললো, 'অ ছোড কত্তা, এইডা কেডা!'

নবু মনে মনে ঠিক করে ফেললো, ওর পরিচয় এদের জানানো যাবে না। ছোট সর্দার মালায়েম গলায় বললো 'অই তুই ক্যাঠা। এহানে আইছস কেমতে!'

নবু হাউমাউ করে বললো, 'মুই কিছু জানি না কত্তা। মোরে ছাইড়া দ্যান। কাম না পাইয়া দুইদিন উপাস দিছি। গিরস্তের বাড়িতে ভাত চাইতে গিয়া খ্যাদান খাইছি। এক ব্যাডায় তো মোরে রাইতে বাড়ির কাছে গুরতে দেইখা চোর মনে কইরা কইছে—মোরে থানায় দেবে। মুই পলাইতে যাইয়া গাতায় পড়ছি। মোরে ছাইড়া দ্যান। মুই আর এই গ্যারামে আহুম না।'

'তুই চুরি করনের লাইগা বাইর ওইছিলি?' জানতে চাইলো ছোট সর্দার।

'মুই চোর না কত্তা। মুই হালুডি করি। পেন্দনের কাপড় ছেলে না, হেই পানে মুই গিরস্ত গো বাড়ি গনে তপনহান আর চাদইরহান নেছেলাম। মোরে থানায়

দিয়েন না কত্তা। বাড়িতে ছোড বাই-বইনগুলা না খাইয়া মরবে হেনে।'

ছোট সর্দার কয়েক মূহূর্ত কি যেন ভাবলো। তারপর বললো, 'তুই বাঘের গরে হান্দাইছস। বাইর অন মুসকিল ওইবো। আমগো ওস্তাদে আহুক। কি কয় হুনি। ছাড়তে কইলে ছাড়া পাবি। নাইলে কুমিররে খিলামু। তয় তোরে থানায় দিবো না এইডা কইবার পারি।' এরপর রোস্তমকে বললো, 'যা পোলারে লাইলনের দড়ি দিয়া হাত-পা বাইন্ধা রাখ। গায়ে তাগদ আছে কইলাম। তুই বইয়া পাহারা দিবি। পালাইলে অর বদলে তরে কুমিরের খাড়ির ভিতরে ফালামু।'

ভেতর থেকে একগোছা মোটা নাইলনের দড়ি এনে নবুকে দু'জনে ধরে হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধলো। ঘরের ভেতর নিয়ে একটা তক্তপোষের ওপর বসিয়ে পা দুটোও বাঁধলো।

নবু একবার বললো, 'মোরে এট্টু পানি দেন ভাইডি।'

একজন ছোট সর্দারের দিকে তাকালো। ইশারায় সম্মতি পেয়ে পাশের ঘর থেকে মাটির সানকিতে পানি এনে ওর মুখের কাছে ধরলো। সবটুকু পানি সে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেললো। ওভাবে পানি খেতে দেখে ছোট সর্দারের প্রাণে বুঝি মায়া হলো। বললো, 'ছ্যারারে একখান রুটি আইনা দে। দড়ি খুলনের কাম নাই, ধইরা খিলাইয়া দে। আমি গিয়া কাকারে খবর কই!'

ছোট সর্দার বেরিয়ে যাওয়ার পর তার সঙ্গী অন্যদের বললো, ওরা কিভাবে নবুকে ধরেছে। 'হেরিকেন নিভাইনা দেইখা আমার সন্দ ওইছিলো। আইয়া ছোট সদ্দাররে কইলাম। ছোট সদ্দার তহন এই গরের থেইকা বাইর ওইয়া উপরে ম্যালা করছিলো। আমার কতা হুইনা নাইমা আইলো। দেহি দরজার ফাঁক দিয়া ছ্যামরায় ফুক্কি মারতাছে।' এই বলে হা হা করে হেসে নবুর দিকে তাকালো।

একজন দুটো রুটি এনে নবুকে খাওয়ালো। খেতে খেতে নবু বললো, 'মেঞা বাই, মোরে আপনে গো এইহানে একখান কাম দ্যান। যা কইবেন হেয়াই করুম।'

লোকটা বললো, 'হেয়া মুই কই ক্যামনে? যারা মোগো কাম দিছে হ্যাগো কও। হ্যাগো মনে ধরলে দেবেনে।'

নবুর খাওয়া শেষ হওয়ার পর একজন এসে বললো, 'রোস্তইম্যা বাদে ব্যাবাকটিরে ছোড কত্তায় ডাহে।'

সবাই উঠে চলে গেলো। রোস্তম বিড়বিড় করে বললো, 'যতো ভোগান্তি দুনিয়ায় আছে ব্যাবাকই রোস্তইম্যার ভাইগ্যে ল্যাহা আছিলে?'

নবু মনে মনে ভাবলো, যেভাবেই হোক এখান থেকে পালাতে হবে। মানুষ খুন করা এদের জন্য কোনো ব্যাপারই নয়। সুড়ঙ্গের পাশে কুয়োর ভেতর যে মানুষের পচা লাশ আর কঙ্কাল দেখেছে সে সব যে এদের কাজ এ কথা বলার

অপেক্ষা রাখে না। অনেকক্ষণ পর বাড়ির কথা মনে হলো। বাড়ি থেকে বেরিয়েছে খুব বেশি হলে ঘন্টা তিনেক হবে। অথচ ওর মনে হচ্ছে কতদিন কেটে গেছে। রাতুল, রবি কি করছে? রাতুল যদি কিছু না বলে সবাই ধরে নেবে সে বিমলদের বাড়িতে থেকে গেছে। রাতুলকে বলেছিলো খোঁজ করলে তাই বলতে। ও এখন কি করছে?

একবার ভাবলো, যদি কখনো এখান থেকে বেরুতে না পারে! রাতুল কি করে জানবে ও কোথায়? পারুলের কথা মনে পড়লো। গতবার যখন ওদের বাড়ি গিয়েছিলো, পারুল বলেছিলো, ওর জন্য পাকা কুল নিয়ে যেতে। বেনুদা ঢাকা থেকে দুটো নারকেলি কুলের গাছ এনে লাগিয়েছিলো। সারা গাছ ছেয়ে আছে কাঁচা-পাকা কুলে। আমবাগানের কাছে বলে কেউ পাড়তে যায় না। মাঝে মাঝে নবুই পেড়ে এনে দেয় সবাইকে।

নবু কি কুল নিয়ে কোনাদিন পারুলদের বাড়ি যেতে পারবে? সাতদিনে একবার অন্তত নবুকে দেখা চাই ওর। নইলে গাল ফুলিয়ে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। আর তিনদিন পরই তো ওরা আসবে রবিদের বাড়িতে দাওয়াত খেতে। বরিশাল থেকে রবির কাকারা আসবে। ওদের ছেলেমেয়েরা নাটক করবে। শুধু নবু থাকবে না ওদের সবার ভেতর। অন্য কেউ ওর অভাব না বুঝলেও পারুল আর রাতুলের নিশ্চয়ই মন খারাপ করবে। ওরা তখন কি করবে? এসব কথা ভাবতে গিয়ে নবুর বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠলো।

রোস্তম আড়চোখে নবুকে দেখে একটা বিড়ি ধরালো। অর্ধেক টেনে নবুকে বললো, 'খাবা?'

নবু মাথা নেড়ে সায় জানালো। কোনোভাবে যদি লোকটার সঙ্গে খাতির করা যায়। নবুর শরীর বলিষ্ঠ হলেও ওর চোখের ভেতর এমন একটা নরোম ভাব আছে দেখলে মায়া লাগে। নবুকে দেখে রোস্তমের নিজের ছেলের কথা মনে হলো। তিন বছর আগে বাওয়ালিদের সঙ্গে সুন্দরবন গিয়ে বাঘের পেটে গেছে। বেঁচে থাকলে এই ছেলেটার মতো হতো। নিজের অর্ধেক খাওয়া বিড়িটা ও নবুর ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিলো।

লোকটার আন্তরিকতা নবুর মন স্পর্শ করলো। ভাব জমানোর জন্য বললো, 'চাচা এইডা কোন জায়গা?'

'এই গ্যারামের নাম তুষখালি। মোরা এহন আছি রাজবাড়ির মাডির নিচের কোডায়।'

নবু ভয় পাওয়া গলায় বললো, 'হেইয়া কও কি চাচা! মুই হুনছি রাজবাড়িতে জ্বীন থাহে।'

রোস্তম শুকনো গলায় বললো, 'জ্বীন থাহে গোরস্থানে। মুই দেখছি।'

'তোমাগো ডর করে না?'

'ডর করলে কি প্যাডে মানবে? প্যাডের জ্বালায় কত আকাম-কুকাম করতে অয়! মোর পোলাডারে বাঘে ধইরা নেছে। বাড়িতে আট-দশটা মানুষ। হ্যাগো খাওয়াইতে ওইবে না?'

একটু ইতস্তত করে নবু বললো, 'চাচা, তোমরা কি মোরে মাইরা হালাইবা?'

'মুই ক্যামনে কমু বাপ! মোরে যা হুকুম পাড়ে মুই হেয়া করি। হ্যাগো কতা যদি কেউ না হোনে কাইট্টা গাঙ্গে ভাসাইয়া দ্যায়। কুমিরের ঘেরের ভিতরে ফেলাইয়া দ্যায়। তোমারে কি হরবে হেইয়া কি মুই কইতে ফারি!'

কাঁদো কাঁদো গলায় নবু বললো, 'চাচা মুই মইরা গেলে মোর ছোড বাইবইনগুলা না খাইয়া মইরবে। মোর মা পাগল ওইয়া যাইবে। মুই তো হ্যাগো কোনো ক্ষেতি করি নাই। মোরে মারবে ক্যা?'

নবুর কথা শুনে রোস্তমের মায়া হলো। কিন্তু ওর কিছুই করার নেই। ওর পাহারা থেকে যদি ছেলেটা পালায় তাহলে ওকেই মেরে ফেলবে। ছোট সর্দার অযথা হুমকি দেয়ার লোক নয়। বললো, 'মোর কিছুই হরনের নাই। যা কওনের হ্যাগো ধারে কইও। এ্যাহন আল্লারে ডাহ। আল্লা ছাড়া তোমারে কেউ বাঁচাইতে পারবে না।' এই বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো—'আল্লা মাবুদ রহম কর।'

আল্লাকে ডাকতে নবুর আপত্তি নেই। তবে এটাও জানে আল্লা আকাশ থেকে নেমে এসে ওর দড়ি খুলে দেবে না। একবার রাগ হলো জ্বীনদের ওপর। জ্বীনরা যে কেন রাজবাড়ি ফেলে গোরস্থানে আড্ডা দিচ্ছে! ওরা যদি রাজবাড়িতে থাকতো তাহলে এভাবে গুণ্ডা—বদমাশদের হাতে পড়ে ওকে বেঘোরে প্রাণটা খোয়াতে হতো না। মনে মনে ভাবলো, রাতুল যদি বুদ্ধি করে বেনুদাকে বলে তাহলে হয়তো দিনের বেলা লোকজন নিয়ে বেনুদা খুঁজতে বেরুবে। কিন্তু ততক্ষণ ওকে কি বাঁচিয়ে রাখবে!

নবুকে খুঁজতে গিয়ে আরেক বিপদ

রবি যতোই নলুক নবুর জন্য ভাবতে হবে না, রাতুল সারারাত ওর কথা ভেবে ঘুমোতে পারে নি। শেষরাতে একটু তন্দ্রামতো এসেছিলো, দুঃস্বপ্ন দেখে

জেগে গেছে। দুঃস্বপ্নও নবুকে নিয়ে। মস্ত উঁচু এক পাহাড়ের ওপরে বিকট চেহারার—পুরোনো গোরস্থানে নবুর দাদা যেমন দেখেছিলো, ওরকম কারা যেন ঘিরে রেখেছে নবুকে। ও চিৎকার করছে—রাতুল বাঁচাও বলে। রাতুর ছুটে যাওয়ার আগেই পাহাড়ের ওপর থেকে লাফ দিয়েছে নবু।

বিছানায় উঠে বসেও রাতুল যেন নবুর আর্তচিৎকার শুনতে পাচ্ছিলো। বাইরে তাকিয়ে দেখলো, আকাশের অন্ধকার ভাব কেটে গেছে। একটু পরেই সূর্য উঠবে। একটা দুটো পাখি মাঝে মাঝে ডাকছে। রবিদের বাড়িতে আসার পর এই প্রথম পাখির ডাক শুনলো রাতুল। উঠে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। রবি তখন গভীর ঘুমে অচেতন। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে রাতুল বললো, 'নবু যেখানেই থাক, ভালো থাকুক।'

রবির ভোরে ওঠার অভ্যাস। সেদিন রাতুলকে আগে উঠতে দেখে অবাক হলো। নবুর কথা ভেবে খানিকটা হিংসেও হলো। ওরই জন্যে রাতুল এতো ভোরে উঠেছে। বললো, 'কখন উঠেছিস রাতুল?'

রাতুল গম্ভীর হয়ে জবাব দিলো, 'এই তো কিছুক্ষণ।'

রাতুলের কথার ধরন দেখে রবি আর কিছু বললো না। চুপচাপ মুখ ধুয়ে নিচে গেলো নাশতা কদ্দুর হয়েছে দেখতে।

আধঘন্টা পর এসে রাতুলকে নাশতা খাওয়ার জন্য ডাকলো। খেতে বসে দেখা গেলো, কাল রাতের মতো রাতুল কিছু খাচ্ছে না। ভাগ্যিস নাদুখালা সামনে ছিলেন না। ওদের নাশতা বেড়ে দিয়ে পাশের বাড়ি গিয়েছেন কার যেন অসুখ করেছে—দেখতে। শুধু রবি একবার বললো, 'কিছুই তো খাচ্ছিস না রাতুল! শরীর খারাপ করবে যে।'

রাতুল ওর কথার কোনো জবাব দিলো না। চা খেয়ে দু'জন চুপচাপ ওপরে উঠে এলো।

জানালা দিয়ে ভোরের এক টুকরো মিষ্টি রোদ ঘরের মেঝের ওপর শুয়ে আছে। রাতুল চেয়ার টেনে জানালার কাছে বসলো। তখনো কুয়াশা পুরোপুরি কাটে নি।

কিছুক্ষণ পর রবি আস্তে আস্তে বললো, 'নবুকে খোঁজার জন্য কোথায় যাবি বলছিলি?'

রাতুল এবার রবির দিকে তাকালো। বললো, 'যেখানে যেখানে ও যেতে পারে সব জায়গায় খুঁজবো। গোরস্থান রাজবাড়ি কোনোটাই বাদ যাবে না।'

রবি বললো, 'তাহলে চল বিমলদের বাড়ি থেকে শুরু করি। এ গাঁয়ে নবুর সবচে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলো বিমল।'

রাতুলের মনে হলো রবি যেন ওকে খোঁচা মারার জন্য 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' কথাটা বললো। রবি কি জানে পারুলের কথা? কিংবা রাতুলের সঙ্গে নবুর কি কথা হয়?

রবি যে ওর সঙ্গে নবুর বন্ধুত্ব ভালোভাবে দেখছে না এটা অনেক আগেই বুঝে গেছে। নবুকে খুঁজতে ওর সঙ্গে আসছে অনেকটা দায়ে পড়ে। তবু এ নিয়ে আর কথা বাড়ালো না রাতুল।

বিমলদের বাড়ি গিয়ে রাতুল যা আশঙ্কা করেছিলো তাই শুনলো। নবু ওদের বাড়ি যায় নি। বিমল দু'দিন হলো মঠবাড়িয়া গেছে ওর পিসির বাড়িতে। ওর ছোট বোন চিনু রবিকে বললো, 'নবুদা সেই যে বল খেলার পর একবার এসেছিলো তারপর আর আসে নি। দাদা বললো, শহর থেকে আসা নতুন বন্ধু পেয়ে নবুদা সব নাকি ভুলে গেছে।' এই বলে আড়চোখে রাতুলের দিকে তাকালো।

রবি কাষ্ঠ হেসে বললো, 'শহরের বন্ধুর জন্যই তো নবুর এই দশা।'

বিমলের মা ওদের কথা শুনে বললেন, 'নবুর কি কোনো ঠিক আছে? কখন কোথায় যায় কাউকে কি বলে যায় বাবা? ওর সঙ্গে থেকে আমার বিমলও হয়েছে তেমনি। তোমরা ভেবো না। দু'দিন পর দেখবে ঠিকই এসে হাজির হয়েছে। তোমরা বসো। চা খাও।'

রবি একবার রাতুলের মুখের দিকে তাকালো। ওর মুখ থমথম করছে। বললো, 'আজ আর চা খাবো না মাসিমা, নিকেরিপাড়ায় যাবো।'

রাতুল কারো সঙ্গে কোনো কথা না বলে বেরিয়ে এলো। রবি ওর সঙ্গে নিকেরিপাড়ার পথে হাঁটতে হাঁটতে বললো, 'ওদের ওপর রাগ করে কি লাভ। ওরা কি করেছে?'

রাতুল শক্ত গলায় বললো, 'তোর কি ধারণা নবুর বাড়ি না ফেরার জন্য আমি দায়ী?'

'বারে, একথা আমি কখন বললাম?'

'ওই মেয়েটাকে তখন যে বললি, শহরের বন্ধুর জন্য নবুর এই দশা—এ কথার মানে কি?'

আমতা আমতা করে রবি বললো, 'আমি তো বলছিলাম—কাল রাতে তোরা প্ল্যান করে আমাকে ভয় দেখাতে না চাইলে নবুকে ওভাবে পালাতে হতো না।'

'ও কি আমার প্ল্যান মতো পালিয়েছে, না তোর চ্যাঁচানোর জন্য?'

'তোরা তো ভালো করেই জানতি অমন করলে আমি ভয় পাবো। আর ভয় পেলে আমি চ্যাঁচাবো না?'

'তুই যদি ভেবে থাকিস নবুর হারিয়ে যাওয়ার জন্য আমি দায়ী, তাহলে আমার সঙ্গে তোর আসার দরকার নেই। আমি একাই খুঁজবো ওকে।'

'কোথায় খুঁজবি?'

'নিকেরিপাড়ায় না পেলে পুরোনো গোরস্থানে খুঁজবো। তোদের হানাবাড়িতে খুঁজবো।'

শুকনো গলায় রবি বললো, 'আমি জানি, আমাকে তোর ভালো লাগছে না। নবুকে খুঁজতে গিয়ে তুই যদি হারিয়ে যাস, আমার কি দশা হবে ভেবে দেখেছিস?'

'আমি কেন হারাবো?'

'তুই আমাদের গাঁয়ে নতুন এসেছিস। কিছুই চিনিস না। তাছাড়া এ জায়গাটা আর দশটা জায়গার মতো নয়। এখানকার সব কথা তুই জানিস না। অনেক কিছু এখানে ঘটে যেতে পারে।' একটু থেমে রবি বললো, 'ঠিক আছে নবুকে তুই-ই খুঁজবি। আমি তোকে শুধু পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। প্লীজ, আমার ওপর রাগ করিস না।' বলতে বলতে রবির গলা বুজে এলো।

'তুই অমন উল্টোপাল্টা কথা বলে মেজাজ খারাপ করে দিস কেন?'

রবি দেখলো রাতুলের গলায় তখনো রাগের ঝাঁঝ। ওর খুব কষ্ট হলো। বললো, 'রাতুল, তুই নবুকে বন্ধু ভাবিস, আমি কিছু বলতে যাবো না। তুই ছাড়া আমার আর কোনো বন্ধু নেই শুধু এটা মনে রাখিস।'

রাতুলের মনে হলো রবির ওপর এতোটা রেগে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে বললো, 'তুই তো বুঝতে পারছিস আমার কি রকম খারাপ লাগছে। মাথার ভেতর মনে হচ্ছে সব তালাগোল পাকিয়ে গেছে। কি বলতে কখন যে কি বলছি নিজেও জানি না।'

নবুকে নিকেরিপাড়ায় না পেয়ে রাতুল আর রবি যখন পুরোনো গোরস্থানে এলো বেলা তখন এগারোটা বাজে। সকালের দিকে আকাশ কিছু সময়ের জন্য পরিষ্কার ছিলো। দশটার পর থেকে সূর্য মেঘের আড়ালে চলে গেছে। কোত্থেকে ছাই রঙের মেঘ এসে গোটা আকাশে ছেয়ে ফেলেছে। এলোমেলো বাতাসও বইতে শুরু করেছে।

রাতুলরা যখন গোরস্থানে ঢুকলো আবহাওয়া তখন আরো বদলে গেলো। চারদিক থেকে ঘন সাদা কুয়াশা এসে ঢুকলো গোরস্থানে, সেই সঙ্গে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। রাতুল আর রবির গায়ে যদিও উলের মোটা পুলোভার ছিলো, শীতের কামড় এড়ানো গেলো না।

রাতুলের মনে হলো শীতের সময় দক্ষিণের সমুদ্রের কাছের আবহাওয়া বোধ হয় এমনই হয়। এ নিয়ে ও কিছু বললো না। অস্বাভাবিকতাটুকু ধরতে পারলো রবি। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ওর হাত-পা আরো ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

ছোটবেলায় রবি অনেকের কাছে শুনেছে অনেক আগে ওদের গাঁয়ের একটা ফুটফুটে সুন্দরী মেয়েকে জ্বীন উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো এই গোরস্থান থেকে। পরে ফেরতও দিয়ে গেছে। সেই মেয়ে নাকি বলেছিলো, হঠাৎ চারপাশ থেকে ঠাণ্ডা কুয়াশার মতো কি যেন ওকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর মিষ্টি একটা গন্ধ পেলো। ব্যস এইটুকুই, আর কিছু ওর মনে ছিলো না। তবে জ্বীনরা নিয়ে গিয়ে

ওর সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার করে নি। ভালো ভালো সব খাবার খাইয়েছে, এতো ভালো যে, জীবনে কখনো এমনটি খায় নি। সুন্দর কাপড় পরতে দিয়েছে। দুধের মতো সাদা আর বকের পালকের মতো নরোম বিছানায় শুতে দিয়েছে। বলেছে আমাদের কাছে থাকো, আমরা মানুষদের জানতে চাই। মেয়েটা থাকে নি। বাপ-মার জন্য সারাক্ষণ কান্নাকাটি করেছে। শেষে ওরা বিরক্ত হয়ে ওকে ওদের বাড়িতে রেখে গেছে। মসজিদের ইমাম সাহেব আর দু'জন মুসল্লি মাগরেবের নামাজের পর দেখেছেন হঠাৎ এক ঝলক আলো আকাশ থেকে নেমে এলো। আলোর সঙ্গে সঙ্গে ঘন সাদা কুয়াশা। কুয়াশার ভেতর রূপোলি রঙের মস্ত বড় একটা তশতরি ভাসছিলো। সেই তশতরির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো মেয়েটা। সঙ্গে সঙ্গে তশতরি আর কুয়াশা মিলিয়ে গেলো। মেয়েটা ফিট হয়ে পড়ে ছিলো সেখানে। ওরা ধরাধরি করে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। মেয়েটা দু'মাস ছিলো জ্বীনদের কাছে, এর ভেতর ওর গায়ের রঙ আরো সুন্দর হয়েছে। এতো সুন্দর যে মনে হতো গা দিয়ে আলো বেরুচ্ছে। ওই মেয়ের আর বিয়ে হয় নি। বিড়বিড় করে মাঝে মাঝে নাকি কাদের সঙ্গে কথা বলতো। আপনমনে হাসতো, গুনগুন করে গান গাইতো, শেষে একদিন পুকরে ডুবে মরে গেলো। মরার পরও নাকি মুখে হাসি লেগে ছিলো।

ছোটবেলা থেকে রবি এসব শুনে বড়ো হয়েছে। অস্বাভাবিক কোনো কিছু দেখলে সবসময় মনে হয়, এর পেছনে নিশ্চয়ই অলৌকিক কোনো শক্তি কাজ করছে। সেদিন পুরোনো গোরস্থানে চারপাশে ঘন সাদা কুয়াশা আর কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে ওর মনে হলো এভাবে রাতুলের একগুঁয়েমিকে প্রশ্রয় দেয়া মোটেই উচিত হয় নি। ক্লাসে শুভদারঞ্জন স্যার কতোদিন বলেছেন অতৃপ্ত আত্মাদের কথা, শত শত বছর ধরে যারা মুক্তির আশায় ঘুরছে, অথচ কেউ ওদের মুক্তি দিচ্ছে না। মৃত্যুর সময় মানুষ যদি সব রকমের বন্ধন—মায়া, মমতা, লোভ, হিংসা, ক্রোধ পরিত্যাগ করতে না পারে তাদের আত্মা নাকি মুক্তি পায় না। সারা পৃথিবীতে শত কোটি আত্মা রয়েছে, যারা অনবরত মুক্তির জন্য ছটফট করছে।

জ্বীনদের কথা বাদ দিলেও পুরোনো গোরস্থান যে সেই সব অতৃপ্ত আত্মাদের সবচেয়ে বড়ো ঘাঁটি, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ডাকাত পূর্বপুরষরা কতো মানুষ মেরে এই গোরস্থানে কবর দিয়েছে কিংবা আদৌ কবর না দিয়ে শেয়াল-শকুন দিয়ে খাইয়েছে—কে তার হিসেব রেখেছে! তাদের অনেকেই প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে শত শত বছর অপেক্ষা করতে পারে! নেহাত রাজবাড়ির জ্বীনরা ওদের ওপর সদয় বলে এইসব আত্মা রবিদের বংশের কারো কোনো ক্ষতি করার সাহস পায় নি। কিন্তু কেউ যদি ওদের ঘুম ভাঙিয়ে বিরক্ত করে, তবু কি ওরা চুপচাপ কবরের ভেতর শুয়ে থাকবে? রবি মনে মনে ভাবলো, রাতুলকে

এসব বলে লাভ নেই। বললেও ও তো আর এসব বিশ্বাস করে না। শুধু নিজে একা এসব ভাবতে গিয়ে বারবার ভয়ে শিউরে উঠছিলো।

হঠাৎ রবির মনে হলো কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বললো, 'নবুর ভীষণ বিপদ। তোমরা ঘরে ফিরে যাও!'

সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়ালো রবি। বুকের ভেতর ধড়াস করে উঠলো। একেবারে অচেনা গলা। কেমন যেন খসখসে ধাতব কণ্ঠস্বর। মনে হলো মানুষের নয়। চাপা গলায় রাতুলকে বললো, 'তুই কিছু শুনতে পেয়েছিস?'

রাতুল অবাক হয়ে বললো, 'কি শুনবো?'

'কারো কোনো কথা শুনতে পাস নি?'

'না তো! কি কথা?'

'আমার মনে হলো কে যেন বললো, নবুর ভীষণ বিপদ, তোমরা ঘরে যাও। কেমন যেন গলাটা!'

রাতুল কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস, গাছের পাতা দুলিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় শুধু সরসর শব্দ হচ্ছে। এছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। বললো, 'নবু যে বিপদে পড়েছে, এটা আমারও মন বলছে। তুই যেতে চাস না, সেজন্য তোর ঘরে ফিরে যাওয়ার কথা মনে হচ্ছে।'

রবি একটু অসহিষ্ণু গলায় বললো, 'আমার মনের কথা নয় এটা। আমি পরিষ্কার শুনেছি।'

'তুই পরিষ্কার শুনলি আর তোর পাশে থেকে আমি কিছুই শুনবো না—এটা হতে পারে?'

'কাল রাতেও তো তুই বলেছিলি আমড়াতলায় তুই কিছু দেখতে পাস নি।'

'এটা ঠাট্টা-ইয়ার্কির সময় নয় রবি।' রাতুল বিরক্ত হয়ে বললো, 'তোকে তো বলেছি, তোর যদি ইচ্ছে না হয় আমার সঙ্গে আসিস না।'

রাতুলের কথায় রবি আরো ভয় পেলো। ওর কথা শুনে মনে হচ্ছে, সত্যি সত্যি ও কিছু শোনে নি। ধাতব কণ্ঠস্বরের অদৃশ্য অধিকারী কি শুধু ওকেই ওর কথা শোনাতে চায়? রবির হঠাৎ মনে হলো বাতাসের সঙ্গে কেমন অদ্ভুত একটা গন্ধ ভেসে আসছে। গন্ধক পোড়ালে যেমন হয়, অনেকটা সেরকম কটু গন্ধ। জোরে জোরে শ্বাস টানলো। কোনো সন্দেহ নেই। বেশ তীব্র গন্ধ। রাতুলকে বললো, 'দাঁড়া, একটা অদ্ভুতরকম গন্ধ পাচ্ছি।'

রাতুলও ওর মতো জোরে শ্বাস নিলো। এবার রবি একা নয়। বাজে রকমের একটা গন্ধ রাতুলেরও নাকে এসে লাগলো। বললো, 'গোরস্থানে এরকম আজেবাজে গন্ধ থাকা অস্বাভাবিক নয়। শেয়াল-টেয়াল হয়তো কোনো কবর খুঁড়ে পচা লাশ বের করেছে।'

রবি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, 'রাতুল, এটা পুরোনো গোরস্থান।

চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের ভেতর এখানে কাউকে কবর দেয়া হয় নি। এখনকার কবর দেয়া হয় নতুন গোরস্থানে, এখান থেকে আধ মাইল দূরে।'

রাতুল চিন্তিত গলায় বললো, 'তাহলে গন্ধ কিসের?'

'সেটাই তো বলছি আমি। এখানে এমন অনেক কিছু ঘটে যার কারণে কেউ বলতে পারে না। প্লীজ রাতুল, তোর পায়ে পড়ি, যে আমার সঙ্গে কথা বলেছে সে আমাদের ভালো চায় বলেই অমন বলেছে। ঘরে ফিরে চল। বেনুদাকে গিয়ে সব খুলে বলি! এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে আমি দমবন্ধ হয়ে মরে যাবো।'

জ্বীনভূত বা অলৌকিক কিছু বিশ্বাস করে না রাতুল। বড়দা-মেজদারা নানাভাবে ওদের বুঝিয়ে দিয়েছে এসব যে নেই। তবু সেদিন মেঘলা দুপুরে পুরোনো গোরস্থানের ভেতর ঘন সাদা কুয়াশার দেয়ালে ঘেরা, কটু গন্ধভরা পরিবেশটাকে ভীষণ অচেনা আর অস্বস্তিকর মনে হলো। গন্ধটা এমনই যে, গা গুলিয়ে বমি আসতে চাইছিলো। তাই রবির কথার আর প্রতিবাদ করলো না। বললো, 'ঠিক আছে চল, বেনুদাকে বলি গে।'

ওরা গোরস্থান থেকে বেরুতে বেরুতে লক্ষ্য করলো বাজে গন্ধটা কমে আসছে আর কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। আমবাগানের কাছে এসে দেখলো অদ্ভুত ব্যাপার-এদিকে কোনো কুয়াশা নেই, শুধু গোরস্থানটা কুয়াশায় ঢাকা। তবে আকাশে তখনো ঘন ছাই রঙের মেঘের পাহাড়।

রাতুলের মাথায় সারাক্ষণ নবুর চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিলো বলে এই ব্যাপারটা ওকে তেমন নাড়া দিলো না। ও ভাবছিলো বেনুদা শুনে কি যাচ্ছেতাই ছেলে মনে করবে ওকে। অথচ বেনুদাকে জানানো দরকার। নইলে নবুর কিছু হলে ওকে চিরদিনের জন্য অপরাধী হয়ে থাকতে হবে। মনে মনে শুধু বললো, 'নবুর যেন কিছু না হয়।'

আমবাগান পেরিয়ে ওরা খিড়কি পুকুরের কাছে এসেছে, হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো। আমড়াতলায় জলজ্যান্ত নবু দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক সেখানে, যেখানে কাল রাতে রবিকে ভয় দেখানোর জন্য বসে ছিলো। নবুর মুখ শুকনো, চুল উসকোখুসকো, চোখ দুটো লাল। পরনের কাপড়-চোপড় সব ভেজা। কেমন যেন অন্যরকমভাবে তাকাচ্ছিলো। রাতুলকে বললো, 'ওদিকে কোথায় গিয়েছিলে?'

'তোমাকে খুঁজতে। সারারাত কোথায় ছিলে তুমি?' উদ্বিগ্ন উত্তেজিত গলায় জানতে চাইলো রাতুল।

'পরে বলবো। বেনুদা কোথায়?' নবুর গলায় ব্যস্ততা।

রবি বললো, 'বোধ হয় চিলেকোঠার ঘরে। সকালে মিস্তিরি এসেছিলো। দেখেছি কি-সব বানাচ্ছে ওখানে।'

নবু রবিকে বললো, 'রাতুলকে নিয়ে এক্ষুনি খেয়ে নে। বেরুতে হবে। আমি কাপড় বদলে বেনুদার সঙ্গে জরুরী কথা সেরে আসি।'

নবুর কথা শুনে রাতুল আর রবি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে নবু ছুটলো চিলেকোঠার দিকে, পেছন পেছন রাতুলরাও।

নাদুখালা খাবার আয়োজন করছিলেন। রাতুলদের দেখে বললেন, 'এই মেঘলায় গোসল করে কাজ নেই। মুখ-হাত ধুয়ে খেয়ে নাও।'

রবি ফস করে বললো, 'নবু এসেছে।'

ভুরু কুঁচকে নাদুখালা বললেন, 'কোথায়?'

'বেনুদার সঙ্গে জরুরী কথা বলতে গেছে।'

'তাই বুঝি! তোমরা খেয়ে নাও। বাবুর যখন ক্ষিদে পাবে তখন ঠিকই খেতে আসবে। ওর জন্যে সবার বসে থাকতে হবে না।'

রাতুল আর রবি ঝটপট মুখ-হাত ধুয়ে খেতে বসে গেলো। ওদের খাওয়া দেখে নাদুখালা বললেন, 'এতো তাড়া কিসের, ঘাটে লঞ্চ ছেড়ে দেবে নাকি!'

রাতুল বললো, 'আজ আমরা বিমলদের বাড়ি বেড়াতে যাবো।'

নাদুখালা বললেন, 'ভালোই হলো। ভাবছিলাম আমি যাবো। রবি শোন, বিমলের মাকে বলবি আমি ওর কাছে এক বয়েম জলপাইর আচার পাই। দু'দিন বাদে বাড়িতে জেয়াফত। আচারটা যেন তোদের হাতে দেয়।'

খাওয়া সেরে রাতুলরা ছাদে উঠতে যাবে—দেখে বেনুদা আর নবু নামছে। ওদের দেখে নবু বললো, 'চল বেরুই।'

সিঁড়ির গোড়ায় আসতেই সবাই নাদুখালার মুখোমুখি। নবুকে দেখে নাদুখালার মেজাজ সপ্তমে উঠলো— 'বাবুর ফেরা হয়েছে দেখছি। চেহারার ছিরি দেখো না! বলে গেলেই হয় রাতে ফেরা হবে না, সারারাত বেতো শরীর নিয়ে জাগতে হয় না। তোর পিঠে যদি আমি আস্ত খড়ম না ভাঙি, জুলপিগুলো যদি—'

বেনুদা ব্যস্ত গলায় বাধা দিলো—'এখন একটু থামো নাদুখালা। আমরা বেরুচ্ছি। মাকে বলে দিও রাতে আমার কয়েকজন বন্ধু খাবে।' এরপর নবুর কানে কানে বললো, 'খুব সাবধান, কেউ টের না পায়।' বলে আর ও দাঁড়ালো না।

বেনুদা পার পেলেও নাদুখালা নবুকে ঠিকই আটকালেন—'আবার কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি? না খেয়ে বাড়ির বাইরে এক পা যদি রেখেছিস তবে—'

'ঠিক আছে খেতে দাও।' বলে ঝাঁঝিয়ে উঠলো নবু। বেনুদাকে বললো, 'আপনি চলে যান, আমি রাতুলদের সঙ্গে বেরুবো।'

নাদুখালা নবুকে খাবার বেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। ওর খাওয়া দেখে রাতুল বুঝে ফেললো, কাল দুপুরের পর থেকে পেটে কিছু পড়ে নি। বললো, 'অস্তে আস্তে খাও নবু এতো তাড়া কিসের!'

নবু এতক্ষণ পর একটু হাসলো—'সত্যিই তাড়া আছে রাতুল। এখন আমাদের দম ফেলার সময় নেই।'

অবশেষে হানাবাড়িতে অভিযান

খেয়ে উঠে বাইরে এসে নবু যে কথাটা বললো, শুনে রবির দম আটকে যাওয়ার দশা—'বলিস কি, রাজবাড়ি যাবি? তোর মাথা খারাপ হলো নাকি! রাতে পাগলা শেয়াল-টেয়াল কামড়ায় নি তো?'

নবু ধমক দিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, রাজবাড়ি যাবো। এখনই। তুই ওভাবে তাকাচ্ছিস কেন, তোকে তো যেতে বলছি না। আমি আর রাতুল যাবো।'

রবির মুখের দিকে তাকিয়ে রাতুলের মনে হলো নবুর ধমক খেয়ে ও বুঝি কেঁদে ফেলবে। নবুকে বললো, 'রবি আমাদের সঙ্গে আসুক না।'

নবু রবির চোখে চোখ রেখে শক্ত গলায় বললো, 'কাল রাতে তুই অমন করে লেজ মাড়ানো কুত্তার মতো চেঁচিয়েছিলি কেন?'

রবি গাল ফুলিয়ে চুপ করে রইলো। রাতুল বললো, 'ওর ভয় কেটে গেছে। ওকে নিতে পারো নবু।'

নবু কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো। তারপর মুখ টিপে হেসে বললো, 'ঠিক আছে আসতে বলো ওকে। এবার ভয়-টয় পেলে ওকে রাজবাড়ির জ্বীনদের কাছে রেখে আসবো।'

রাতুল রবির কাছে এসে ওর কাঁধে হাত রেখে নরোম গলায় বললো, 'রাগ করছিস কেন? তোর চ্যাঁচানোর জন্য মনে হচ্ছে নবুর ওপর দিয়ে ধকল কম যায় নি। তাই ওর মেজাজ অমন তিরিক্ষি হয়েছে। চল যাই।' এরপর রবির কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'ভয় পাওয়া একেবারেই চলবে না।'

রবি কোনো কথা না বলে ওদের সঙ্গে হাঁটতে লাগলো। নবু বললো, 'নদীর ধার দিয়ে ঘুরে যাবো। আমবাগান দিয়ে গেলে বাড়ির কেউ দেখে ফেলতে পারে। বিশেষ করে আবেদালি দেখলে বিপদ হবে।'

রাতুল বললো, 'কাল রাতে কোথায় ছিলে বললে না তো!'

নবু এক কথায় জবাব দিলো, 'রাজবাড়ি।'

'সে কি! সারারাত ওখানে ছিলে?'

রহস্য হেসে নবু মাথা নেড়ে সায় জানালো। রবি ওর সঙ্গে কথা না বললেও শোনার জন্য কান দুটো খাড়া করে রেখেছিলো।

'ওখানে কি কিছু দেখেছো?'

'চুপ!' চাপা গলায় বললো নবু—'আবেদালি আসছে।'

রাতুল সামনে তাকিয়ে দেখলো নদীর কিনার থেকে আবেদালি উঠে আসছে। ওদের দেখতে পেয়ে খুবই অবাক হলো সে। কাছে এসে প্রশ্ন করলো, 'দাদারা এই মুহি কোই যাও?'

রাতুল বললো, 'নিকেরিপাড়ায় মাছ ধরা দেখতে যাবো।'

আবেদালি অবাক হয়ে বললো, 'অ মোর খোদা, মাছ ধরা আবার দেহার জিনিস নিহি?'

নবু মুখ টিপে হেসে বললো, 'ওরা শহরের মানুষ। কোনোদিন দেখেছে নাকি এসব! তা, তুমি এদিকে কোথায় গিয়েছিলে?'

'মুই গেছিলাম গরু টোহাইতে। মোগো ধলা গরুডা এ মুহি কই জানি গেছে। আপনেরা যাওনের কালে দেইখ্যো—।'

'ঠিক আছে তুমি বাড়ি যাও। বিকেলে বেনুদার মেহমানরা আসবে। তোমাকে ঘরে থাকতে বলেছে।'

আবেদালি চলে যাওয়ার পর নবু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

যেতে যেতে রাতুল মুখ টিপে হেসে নবুকে বললো, 'সারারাত রাজবাড়িতে ছিলে, ভরদুপুরে যাদের নাম নিতে নেই—তেনাদের দেখো নি?'

নবু আড়চোখে একবার রবিকে দেখলো। তারপর নিরীহ গলায় বললো, 'দেখবো না কেন, দেখেছি, কথা শুনেছি।' তারপর গম্ভীর হয়ে বললো, 'ঠাট্টা নয় রাতুল, এখনো যে আমি বেঁচে আছি—নেহাত পূর্বপুরুষদের সৎকাজের জন্য। পরে সব বলবো। এখন পা চালিয়ে হাঁটো।'

গাঁয়ের গেছো ছেলে নবু। লম্বা পা ফেলে দশ-পনেরো মাইল হাঁটা যার কাছে কিছুই না—ওর সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে গিয়ে রাতুল কেন, রবি পর্যন্ত হাঁপিয়ে উঠলো।

নদীর ধার দিয়ে রাজবাড়ি যেতে ওদের এক মাইলের ওপর হাঁটতে হলো। আকাশ তখনো মেঘলা, তবে কুয়াশা নেই, কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসও নেই। হাঁটতে ওদের বেশ আরাম লাগছিলো। রাজবাড়ির কাছে এসে অবশ্য রাতুল ঘাবড়ে গেলো। এখানে-সেখানে এতো ঘন কাঁটাঝোপ যে গা বাঁচিয়ে চলা মুশকিল। কাঁটার খোঁচা লেগে ওর হাতের কয়েক জায়গা ছড়ে গেলো। পুলোভারের উল খুলে গেলো। এর ভেতর টেরও পায় নি কখন থেকে দুটো চিনে জোঁক স্যাণ্ডেলের ফাঁক দিয়ে ওর পা কামড়ে পড়ে আছে। রবির চোখে পড়েতেই ও বললো, 'রাতুল একটু দাঁড়া।'

জোঁক দেখে রাতুল রীতিমতো লাফাতে লাগলো। নবু বললো, 'দাঁড়াও বীরপুরুষ, তুলে দিচ্ছি।'

অবলীলাক্রমে জোঁক দুটোকে টেনে তুলে রবারের মতো টান মেরে ছিঁড়ে ফেললো নবু। রাতুলের পায়ের যে জায়গাটায় জোঁক লেগেছিলো সেখান থেকে রক্ত বেরুতে দেখে ঘাস চিবিয়ে লাগিয়ে দিলো। বললো, 'রক্ত বেশি খায় নি। খেলে আপনা থেকেই ঝরে যেতো।'

রাতুলের সারা শরীর অস্বস্তিতে শিরশির করছিলো। ওর মনে হচ্ছিলো প্যান্টের ভেতর একটা-দুটো ঢুকে পড়াও বিচিত্র কিছু নয়। নবু আর রবিকে দেখলো।—কোনো বিকার নেই, কায়দা করে দু'হাত দিয়ে কাঁটাঝোপ সরিয়ে এগিয়ে চলেছে। জোঁকের ভয়ে রাতুলও পা চালালো।

কাঁটাঝোপ ঠেলে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর ছোট-বড় তিনটা উঁচু ঢিবি পেরুতে হলো ওদের। রাতুল বুঝলো, এগুলো রাজবাড়ির ধ্বংসস্তুপের অংশ, গাছপালা গজিয়ে গেছে, ফাঁকে ফাঁকে ইট-সুরকি দেখা যাচ্ছিলো। রাজবাড়ির চারভাগের তিনভাগ মাটিতে মিশে গেছে। শুধু গোটা চারেক ছোট বড় মোটা থাম আর উত্তর দিকে নিচের তলার কয়েকটা ঘর এখনো পুরোপুরি ধসে পড়ে নি, যদিও দরজা-জানালার জায়গাগুলো গর্তের মতো মনে হচ্ছে। একটা অশ্বত্থ গাছ একপাশের দেয়াল বেয়ে উঠেছে।

অনেক দিনের চেনা জায়গার মতো এতোটুকু ইতস্তত না করে নবু একটা গর্তের ভেতর ঢুকে গেলো। রাতুল আর রবি বিস্ময় চেপে অনুসরণ করলো ওকে। ভাঙাচোরা কয়েকটা ঘর পেরিয়ে নবু একটা আস্ত ঘরে এসে বসে থামলো। রহস্যময় গলায় বললো, 'কি মনে হচ্ছে?'

অবাক হয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখে রাতুল বললো, 'তুমি কি এখানে ছিলে? মনে হয় এখানে লোকজন থাকে!'

নবু মুখ টিপে হাসলো, 'তোমার প্রথম কথার জবাব—না। দ্বিতীয় কথার জবাব—হ্যাঁ।'

'কারা থাকে?'

আড়চোখে রবির দিকে এবার তাকিয়ে নবু বললো, 'কারা আবার! রবি যাদের জ্বীন মনে করে, যখ মনে করে, তারা!'

'আহ্, খুলেই বলো না ছাই।' রাতুল অধৈর্য হয়ে উঠলো।

'রাজবাড়ি এখন ডাকাতদের ঘাঁটি।'

'তুমি জানলে কি করে?'

'আগে কিছুটা অনুমান করেছিলাম। তবে সব টের পেয়েছি কাল রাতে।'

'কিভাবে?'

'বলবো। এখন নয়, পরে। বেশিক্ষণ এখানে কথা বলা ঠিক হবে না।

যে-কোনো সময়ে যে-কেউ আসতে পারে। এখন এদিকে এসো।'

নবু পাশের ঘরে ঢুকলো। এ ঘরটা বেশ পরিষ্কার। ধুলোবালি নেই। কয়েকটা হোগলাপাতার চাটাই বেছানো। ঘরের এক কোণে মস্ত বড় একটা সিন্দুক। নবু বললো, 'এটা খুলতে হবে।'

তিনজনে মিলে মহাকষ্টে সিন্দুকের ভারি ঢালাটা খুললো। ঘরের ভেতরটা রীতিমতো অন্ধকার। স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছিলো না। নবু এক লাফে সিন্দুকের ভেতর ঢুকে গেলো। কোণা হাতড়ে বের করে আনলো একটা ন্যাকড়ার পুঁটলি। রাতুলের হাতে দিয়ে বললো, 'ধরো এটা।'

তিনজনে মিলে সিন্দুকের ডালা বন্ধ করে ঘরের বাইরে খোলা জায়গায় এলো। রাতুলের হাত থেকে পুঁটলিটা নিয়ে নবু ওটা খুললো। সঙ্গে সঙ্গে রাতুল আর রবির চোখ ছানাবড়া।

'এ কি!' চমকে উঠে রাতুল বললো, 'এ যে সব সোনার গয়না। কোত্থেকে এলো?'

নবু রহস্য হেসে রবিকে বললো, 'দ্যাখ তো, চিনতে পারিস কিনা?'

রবি মাথা নাড়লো। নবু বললো, 'তুই না চিনলেও খালা ঠিক চিনবে। এগুলো তোদের বাড়ির চুরি যাওয়া গয়না।'

গহনার ভেতর ছ'টা মোহরও দেখতে পেলো রাতুল। আরবীতে কি যেন লেখা। বললো, 'এগুলো মনে হচ্ছে সোনার মোহর!'

'হ্যাঁ, মোহরই বটে। তবে কার—এখনো জানতে পারি নি।'

রাতুল অধৈর্য হয়ে বললো, 'নবু, তুমি কি দয়া করে সব খুলে বলবে? টেনশনের চোটে আমার নার্ভ-টার্ভ সব ছিঁড়ে যাবে।'

'ঘরে গিয়ে বলবো। এখানে আর থাকা ঠিক হবে না,' এই বলে নবু পুঁটলির ভেতর থেকে মোহরগুলো বের কের রাতুলের পকেটে ঢুকিয়ে দিলো— 'এগুলো আলাদা থাক।'

বাড়ি ফিরে কাউকে কিছু না বলে ওরা তিনজন ওদের ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মোড়া টেনে গোল হয়ে বসলো। নবু কিভাবে আমড়াতলা থেকে পালাতে গিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকলো আর ধরা পড়লো, একে একে সব বললো। এর পরের ঘটনা শুধু বিস্ময়কর নয়, রীতিমতো রোমহর্ষক।

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় নবু রোস্তমের পাহারায় থাকার সময় মনে মনে ঠিক করেছিলো যেভাবে হোক পটিয়ে না পারলে রোস্তমকে ঘায়েল করেই ও পালাবে। নিজের ছেলের কথা ভেবে নবুর ওপর রোস্তমের মায়া পড়ে গেলেও এটাও রোস্তম ভালোভাবে জানতো—নবুর পালানো মানে ওর মৃত্যু। মৃত্যু মানে বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েদেরও মৃত্যু। বাড়ির সব কথা যদিও নবুকে বলেছে, ওকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে নিজের অক্ষমতার কথাও রোস্তম পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে।

শেষ রাতের দিকে নবুর তন্দ্রামতো এসেছিলো। এমন সময় শুনলো কে যেন ফিসফিস করে বলছে, 'ঘুমোবে না। উঠে পড়ো। দু'নম্বর ঘাঁটিতে নিয়ে তোমাকে মেরে ফেলবে। তুমি নৌকা থেকে যেভাবে হোক পালাবে।'

কথা শুনে নবুর তন্দ্রার ঘোর কেটে গেলো। তাকিয়ে দেখলো—হারিকেনটা জ্বলছে, দেয়ালে হেলান দিয়ে রোস্তম ঘুমোচ্ছে, ঘরে কেউ নেই। কে ওকে অমন কথা বললো? ও কি স্বপ্ন দেখছিলো? কিছুই বুঝতে পারছিলো না নবু। এ কি রকম স্বপ্ন দেখা? কিসের দু'নম্বর ঘাঁটি, কোথায় নৌকা—মাথায় ওর কিছুই ঢুকছিলো না।

এমন সময় নবু শুনতে পেলো, পাশের ঘরে কারা যেন কথা বলছে। গড়িয়ে গড়িয়ে ও দরজার কাছে গেলো। সেখানেই শুনলো বড়বাড়ির গয়না চুরির বৃত্তান্ত আর নতুন করে চুরির ষড়যন্ত্র। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলো আট-দশজন লোক হারিকেনের চারপাশে বসে। ওদের ভেতর তিনজন নবুর খুবই চেনা। ওরা বলছিলো—আজ রাতে আবার তারা বড়বাড়িতে হানা দেবে। নতুন বউ এসেছে অনেক গয়না নিয়ে। আজকের কাজ ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলে কাল থেকে কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দেবে। দুই বাড়ির কাজ একরাতেই সারতে হবে। নইলে অন্যরা সাবধান হয়ে যাবে। ওরা ঠিক করেছে আজ রাতে ওরা চৌধুরী বাড়িতেও হামলা চালাবে। এই দুই বাড়ি থেকে কি পরিমাণ সোনা পাওয়া যাবে তারও একটা হিসেব করেছে ওরা। বিলি বন্দোবস্তের কথা বলতেই একজন ওপরের ঘর থেকে সিন্দুক খুলে এই গয়নাগুলো আনলো। বড়বাড়ির গয়না চিনতে নবুর এতোটুকু ভুল হয় নি। এরপর সে দরজার কাছ থেকে সরে গিয়ে আবার আগের জায়গায় গিয়ে বসলো।

নবুর কথা শুনে রবির চোখ দুটো মনে হলো ঠিকরে বেরিয়ে যাবে। চাপা উত্তেজিত গলায় বললো, 'তোর কানে কানে যে কথা বলেছে—মনে আছে গলাটা কি রকম ছিলো?'

একটু ভেবে নবু বললো, 'মনে আছে। গোরস্থানে থাকতে যে গলাটা শুনেছিলাম—আমাকে পালিয়ে যেতে বলেছিলো, ঠিক সেই গলা। কেমন যেন খসখসে, মনে হচ্ছিলো কোনো মেশিনের ভেতর থেকে বুঝি শব্দটা আসছে। কেন বল তো?'

'আমি আজ গোরস্থানে ঠিক সেরকম গলা শুনেছি।'

রাতুল রবিকে বাধা দিয়ে নবুকে বললো, 'তুমি যে বললে তিনজন তোমার চেনা—ওরা কারা?'

নবু একটু চুপ থেকে আস্তে আস্তে বললো, 'একজন আমাদের আবেদালি, একজন চৌধুরী বাড়ির রমজান, আরেকজন সরকার বাড়ির কানাই। আজ রাতে আবেদালি আর রমজান দুই বাড়ির দরজা খুলে দেবে। আগেরবার দরজা খুলতে

আবেদালি দেরি করেছে বলে বকুনিও খেলো।'

'কি সর্বনাশ! আজ রাতেই বাড়িতে ডাকাতি হবে?'

মাথা নেড়ে সায় জানালো নবু।

'বেনুদা কোথায় গেছেন?'

'চৌধুরীদের বাড়িতে।'

রবি বললো, 'থানায় খবর দিলে ভালো হতো না?'

'না।' শক্ত গলায় নবু বললো, 'থানায় ওদের লোক আছে। সেখানে গেলেই ওরা টের পেয়ে যাবে। বেনুদার সঙ্গে আমি কথা বলেছি। ঠিক হয়েছে চৌধুরীদের আগে সাবধান করে দিতে হবে।'

রাতুল বললো, 'তারপর কি হলো বলো না! তুমি ওখান থেকে পালালে কিভাবে?'

কাষ্ঠ হেসে নবু বললো, 'সেটাই তো আসল রহস্য।'

দরজার কাছ থেকে সরে এসে নবু আগের জায়গায় বসেছে। হঠাৎ পেছনে দরজা খোলার শব্দ পেয়ে চোখ বুজে ও ঘুমের ভান করলো। কে যেন এসে পা দিয়ে পিঠে খোঁচা মেরে বললো, 'এ্যাই ওঠ।'

নবু তখন চমকে উঠে পেছনে তাকিয়ে দেখে ছোট সর্দার। ছোট সর্দার বললো, 'তরে মনে অয় বাচাইবার পারুম না। কাকায় কইছে তরে দুই নম্বর ডেরায় লয়া যাইতে। পায়ের বন্ধন খুইলা দিতাছি। উল্টাসিদা কাম করবি না। তয় কইলাম রাস্তার মইদ্যে তর প্যাটটা নামায়া দিমু ড্যাগার দিয়া।'

এই বলে কোমরে গোঁজা ড্যাগার দিয়ে নবুর পায়ের বাঁধন কেটে দিলো। নবু উঠে দাঁড়ালো। ছোট সর্দার বললো, 'ল, যাই, ম্যালা দূর যাঅন লাগবো নৌকায় কইরা।'

লোকটার কথা শুনে চমকে উঠলো নবু। এতোক্ষণ যেটাকে স্বপ্ন ভেবেছিলো সেটা কি তাহলে স্বপ্ন নয়? সত্যি সত্যি তাকে নৌকায় করে দু'নম্বর ডেরায় নিয়ে মেরে ফেলবে!

এ নিয়ে বেশিক্ষণ ভাববার সময় পেলো না নবু। ছোট সর্দার ওকে ধরে পাশের ঘরের ভেতর দিয়ে ওপরে উঠলো। ওপরেও ঘর, যে ঘরটায় ভারি সিন্দুকটা রাখা ছিলো সেইটা। তারপর ওকে নিয়ে লোকটা নৌকায় উঠলো।

ছইওয়ালা বেশ বড় নৌকা। একজন মাঝি হালের কাছে বসে ছিলো। ওরা নৌকায় উঠে বসতেই নঙ্গর তুলে মাঝি নৌকা দিলো বলেশ্বরীর ভাটির দিকে।

তখনও সূর্য ওঠে নি। আকাশের অন্ধকার ফ্যাকাসে হয়েছে মাত্র। ঘন কুয়াশা চারদিকে। ভাটার টানে নৌকা যেন তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিলো। যদিও কুয়াশার জন্য দশ হাত দূরের জিনিস ভালো দেখা যাচ্ছিলো না।

হালে ছিলো মাঝি, ছইয়ের নিচে নবু। ছোট সর্দার বৈঠা বাইছিলো। হাত

দুটো যেরকম বেকায়দাভাবে পিছমোড়া করে বাঁধা, কিভাবে পালাবে কিছুই ভেবে উঠতে পারছিলো না নবু। মনে মনে চাইছিলো, একটা কিছু ঘটুক, একটা ঝড় উঠে নৌকাটা উল্টে যাক, কিংবা বাজ পড়ে গুণ্ডা লোকটা মরে যাক—এছাড়া পালাবার কোনো পথ নেই। একবার মনে হলো, স্বপ্নের সেই কণ্ঠস্বর যদি বলতো কিভাবে পালাতে হবে।

এ কথাটা নবুর মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৌকাটা যেন জমাটবাঁধা কুয়াশার কোনো পাহাড়ের ভেতর ঢুকে গেলো। মাঝি, সর্দার, নৌকা সবকিছু ঢাকা পড়লো কুয়াশায়। নবুর মনে হলো, মুহূর্তের ভেতর বুঝি ও মেঘের রাজ্যে চলে গেছে। ঠিক তখনই শুনলো সেই ফিসফিসে বাতাসের মতো কণ্ঠস্বর—'তোমার দাদা আমাদের অনেক উপকার করেছিলেন। তুমি এর প্রতিদান পাবে। ভয় পেও না। নৌকা ডুবিয়ে দেবো। লোক দুটো মরে যাবে।'

নবু বলতে চাইলো, 'কিভাবে পালাবো, আমার হাত যে বাঁধা?'

সেই কণ্ঠস্বর আবার বললো, 'তোমার হাতের দড়ির বাঁধন খুলে গেছে। তৈরি হও।'

সঙ্গে সঙ্গে শোঁ শোঁ শব্দ শুনলো নবু। মনে হলো প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছে ভীষণ ঝড়, সবকিছু যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে। বলেশ্বরী নদীতে বড়ো বড়ো ঢেউ উঠলো। নৌকা দুলতে লাগলো। আকাশে বিদ্যুৎ চমকালো, আর তার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া কাঁপিয়ে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়লো। চোখ ঝলসানো বিদ্যুৎ আর কান ফাটানো সেই বাজ পড়ার শব্দের ঘোর কেটে যেতেই নবু দেখলো পেছনে হালের মাঝি ঠিকই আছে, গলুইয়ে বসা শয়তানটা শুধু নেই। আরো অবাক হয়ে দেখলো হাত থেকে দড়ির বাঁধন খসে পড়েছে।

এরপর এলো এক দমকা বাতাস। নৌকাটাকে মুহূর্তের ভেতর শুন্যে তুলে উত্তাল নদীতে আছাড় মারলো। ছিটকে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে গিয়ে পড়লো নবু। বাঁচার তাগিদে প্রাণপণে তীরের দিকে সাঁতরাতে লাগলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড় থেমে গেলো। কুয়াশাও কিছুটা হালকা হলো। তবু ভাটির টানে উজানে সাঁতার কাটতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো নবুর। প্রায় ঘন্টাখানেক সাঁতারানোর পর তীরে এসে পৌঁছলো। পাড়ে উঠে অনেকক্ষণ চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলো। ঘটনাটা কি ঘটলো, কিছুই ওর বোধগম্য হচ্ছিলো না। মাথাটা তখন থেকে ভার হয়ে আছে। নবু শুনছে অনেক মানুষ আছে যারা বিপদ আসার আগে নাকি আঁচ পায়। ওর ভেতর কি সেরকম কোনো ক্ষমতা আছে? নাকি সত্যি সত্যি রাজবাড়ির জ্বীনরা ওকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালো? এ নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবারও সময় পেলো না। আজ রাতে বাড়িতে ডাকাতি হবে। যেভাবেই হোক ঠেকানো দরকার। সবার আগে কথা বলতে হবে বেনুদার সঙ্গে। এ কথা মনে হতেই ও উঠে দাঁড়ালো।

মসজিদের কাছে এসে ও পুরোনো গোরস্থানে রাতুলদের দেখতে পেয়ে বাড়িতে না ঢুকে আমড়াতলায় এসে দাঁড়িয়েছিলো।

নবুর কথা শুনে রবির মনে রাজবাড়ির জ্বীনদের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেলো। ওরা সাহায্য না করলে নবুকে কেউ বাঁচাতে পারতো না।

রাতুল অবশ্য নবুর অলৌকিক ঘটনা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছিলো না। ও ভাবছিলো আজ রাতে এ বাড়িতে ডাকাতি হবে। ডাকাতদের লোক আবেদালি এ বাড়িতেই আছে। অস্বাভাবিক কিছু দেখলে আবেদালি ডাকাতদের সাবধান করে দেবে। নবুকে বললো, 'আজ রাতে ডাকাতদের ধরার ব্যাপারে কিছু ভেবেছো?'

নবু কিছুটা উদভ্রান্তের মতো বললো, 'আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না রাতুল। কিছুই ভাবতে পারছি না। ভীষণ ভার হয়ে আছে মাথার ভেতরটা।'

রাতুল বুঝলো, বেচারার ওপর দিয়ে কাল রাত থেকে ধকল তো কম যায় নি। ওর জায়গায় রবি হলে এতোক্ষণ ভয়েই হার্টফেল করতো। বললো, 'বিপদ হচ্ছে কাউকে কিছু বলা যাবে না। আমরা তিনজন আর বেনুদা ছাড়া কেউ জানলেই বিপদ। আবেদালি নিশ্চয়ই সবার ওপর নজর রেখেছে।'

নবু মাথা নেড়ে সায় জানালো—'ঠিক বলেছো।'

এমন সময় আবেদালি এসে ঘরে ঢুকলো। চোখ টিপটিপ করে ওদের তিনজনকে দেখে নিরীহ গলায় বললো, 'কি দাদারা, আইছ কুন কালে? নদীর ধারে কিছু দেখছো?'

আবেদালি কিছু শুনতে পায় নি তো? ওকে দেখে নবু আর রবি দু'জনেই থতমত খেলো। রাতুল বললো, 'দেখার সুযোগ পেলাম কই। রবিটা যা ভীতু! ও তো যেতেই দিলো না। বললো, ফিরতে ফিরতে নাকি সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তারপর নাকি কারা সব বেরোয়! জোর করে চলে এলো। কাল তুমি যেও আমাদের সঙ্গে। রবিকে নিয়ে চলাই বিপদ।'

আবেদালি হেসে আদর করে রবির পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো—'রবি দাদা ঠিক হরছে। দিনমানেও ওইসব খারাপ জায়গায় থাকতে নাই। কোনকালে কার নজর পড়ে হেইয়া কওয়া যায়?'

নবু বললো, 'আবেদালি, কাল যে বলেছিলে আমাকে ঘুড়ি আর নাটাই কিনে দেবে, আজ যাবে? পথে খাওয়ার জন্য তোমাকে একটা টাকা দেবো।'

আবেদালি মাথা নাড়লো—'আইজ পারুম না। সকাল থেইকা গাটা ম্যাজম্যাজ করতে আছে। অহন একটু ঘুম না দিলে কাইল ক্ষেতে কাম হরতে পারুম না। যাই গরুগুলানরে জাব কাইট্টা দেই।'

আবেদালি চলে যেতেই নবু বললো, 'দেখলে শয়তানটার কাণ্ড! রাতে জাগতে হবে তো তাই পৌষ মাসের বিকেলে ওর না ঘুমালে চলবে না।'

'আহা বেচারা, কালও তো সারারাত ঘুমোয় নি! পরপর রাত জাগলে অতো

বড়ো শরীরটা ভেঙে পড়বে না!' রাতুলের কাথা শুনে নবু আর রবি হো হো করে হেসে উঠলো।

হঠাৎ বুদ্ধিটা এলো রাতুলের মাথায়। চাপা গলায় নবুকে বললো, 'ঘুমোতে যখন চাইছে, বাছাধনকে এক ঘুমে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেই, কি বলো?'

নবু আর রবি হুমড়ি খেয়ে পড়লো ওর ওপর। আইডিয়াটা খুলে বললো ওদের দু'জনকে। শুনে ওদের চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগলো। নবু বললো, 'ঠিক বলেছো এছাড়া আর কোনো পথ নেই।'

ডাকাত ধরা পড়লেও রহস্য জানা গেলো না

চৌধুরীদের বাড়িতে খবর দিয়ে বেনুদা থানা হয়ে ফিরলো শেষ বিকেলে। ওরা তিনজন তখন ছাদে বসে দেখছিলো সন্দেহজনক কিছু দেখা যায় কিনা। রবি ভাবছিলো সকালে পুরোনো গোরস্থানে এ কি দেখলো ও। যাতোবার ও রহস্যময় কণ্ঠস্বরের কথা ভাবলো, ততোবারই রোমাঞ্চিত হলো।

রাতুলের মাথায় তখন শুধু ডাকাত ধরার চিন্তা। ভীষণ উত্তেজনা বোধ করছিলো। প্ল্যানমতো সব যদি না করা যায় তখন কি হবে? চৌধুরী বাড়িতে বেনুদা খবর দিতে গেছে। সেখান থেকেও তো জানাজানি হতে পারে। ওরা যদি নবুর আসল পরিচয় জানতে পারে, ওকে কি রাখবে?

নবু কোনো কিছুই ঠিকমতো ভাবতে পারছিলো না। কখনো ভৌতিক কণ্ঠস্বর, কখনো নৌকার ঘটনা আবার কখনো ডাকাত ধরার কথা ভাবতে গিয়ে সব গুলিয়ে যাচ্ছিলো। মাথা ধরা তখনো যায় নি। রাতুল অবশ্য কি একটা মলমের মতো কপালে লাগিয়ে দিয়েছিলো, ওর বড়দা নাকি ওটা চীন থেকে এনেছিলেন। ওতে কিছুক্ষণের জন্য আরাম লাগলেও আবার মাথা ধরেছে।

বেনুদা এসে বললো, 'ও বাড়ির সব ব্যবস্থা ঠিক করে এলাম। এবার আমরা কি করবো সেটা নিয়ে ভাবতে হবে।'

'ঠিক করে ফেলেছি কি করবো।' এই বলে রাতুল ওর পরিকল্পনার কথা খুলে বললো।

শুনে বেনুদা অবাক হলো—'কি আশ্চর্য, আমিও তো চৌধুরীদের একই প্ল্যান দিয়ে এসেছি।'

নবু বললো, 'আমাদের প্ল্যানটা রাতুলের মাথা থেকে এসেছে।'

বেনুদা ওর পিঠ চাপড়ে বললো, 'আমরা হলাম গ্রেট ম্যান—কি বলো?'

রাতুল গম্ভীর হয়ে বললো, 'আমাদের হাতে সময় বেশি নেই।'

নবু উঠে দাঁড়ালো—'আমি নিচে গিয়ে মাকে বলে আসি, আবেদালির হাতে আমাদের চাটা যেন ওপরে পাঠিয়ে দেয়।'

বেনুদা রাতুলকে বললো, 'তোমার জিনিস ঠিক আছে তো?'

রাতুল গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে সায় জানালো।

নবু এসে হাসতে হাসতে বললো, 'আবেদালি বেচারা ঘুমিয়ে পড়েছিলো। মনে হয় ওর কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি।'

রাতুল নিরীহ গলায় বললো, 'তাতে কি, আবার ঘুমোবে।'

একটু পরে মুখ কালো করে আবেদালি চায়ের ট্রে হাতে ছাদে এলো। বেনুদা ওকে বললো, 'তোমার শরীর খারাপ নাকি আবেদালি? মুখটা কেমন শুকনো শুকনো লাগছে!'

গলায় অসুখ অসুখ ভাব এনে আবেদালি বললো, 'হ বেনুদাদা। গাডা ম্যাজম্যাজ হরে।'

রাতুল সমবেদনা দেখিয়ে বললো, 'একটু চা খেয়ে নাও। ভালো লাগবে।'

আবেদালি রেগেমেগে বললো, 'হেই চা খাইতে যাইয়াই তো মুই বহাডা খাইলাম। নিত্য কি খাই? আইজ এট্টু চাইতে গেছি—'

বেনুদা হাঁ হাঁ করে উঠলো—'সে কি কথা আবেদালি, চা কেন দেবে না। ক্ষেমির মা বড় বাড় বেড়েছে দেখছি। তুমি এখানে বসে এক কাপ খেয়ে নাও।'

একগাল হেসে আবেদালি বললো, 'তা এট্টু খাইলে মন্দ অয় না। আপনেগো কাপে খামু নিহি?'

রাতুল বললো, 'তাতে কি! বসো, আমিই বানিয়ে দিচ্ছি। তুমি বরং সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দাও। ক্ষেমির মা আর দেখতে পাবে না।'

'ক্ষেমির মারে মুই ডরাই নিহি?' বলে গজগজ করতে করতে আবেদালি দরজা বন্ধ করতে গেলো। এই ফাঁকে আগে থেকে গুঁড়িয়ে রাখা গোটা দশেক ঘুমের বড়ি ওর কাপে ঢেলে চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিলো।

নবু রাতুলকে বললো, আমি চা খাবো না। আমার কাপটা আবেদালিকে দাও।'

খুব আয়েশ করে চা খেলো আবেদালি। কিছুক্ষণ পর বললো, 'না গো বেনুদাদা, যুইত লাগে না। যাই গুরুগুলানরে ঘরে উডাইয়া এট্টু কাইত হই।'

আবেদালি চলে যাওয়ার পর সবাই একচোট হাসাহাসি করলো। বেনুদা

বললো, 'বেশি হেসো না, আসল কাজ এখনো বাকি। মাকে বলতে হবে আবেদালি ফিরে এলে যেন চিলেকোঠায় ঘুমোয়।'

ওরা এলো অনেক রাতে। অন্ধকারে বাইরের ঘরে বেনুদা, নবু, রবি আর রাতুল মোটা বাঁশের লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলো। কয়েকবার মহড়া দেয়া হয়ে গেছে।

টুক-টুক-টুক। দরজায় তিনটা শব্দ হলো। আস্তে বেনুদা দরজা খুলে দিলো। এক এক করে পাঁচজন ঢুকলো। সামনেরটা চাপা গলায় বললো, 'সব ঠিক আছে?'

বেনুদা বললো, 'হুঁ।'

তক্ষুণি সবাই মিলে সামনের লোকগুলোর ঘাড়ের ওপর লাঠি চালালো। মাথায় মারতে নিষেধ করেছিলো বেনুদা। সামনের লোকগুলো পড়তে না পড়তেই পেছনেরটাকেও বাড়ি মেরে শুইয়ে দেয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বেলে সবাইকে ডাকা হলো। নবু আর বেনুদা মিলে সব ক'টাকে বেঁধে ফেললো।

চিলেকোঠার ঘরে তখন ভোঁস ভোঁস করে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে আবেদালি। এতো কিছু হয়ে গেলো, কিছুই টের পেলো না ও।

ভোরবেলা দারোগা এলো। কোমরে দড়ি বেঁধে সব ক'টাকে গাড়িতে নিয়ে তোলা হলো। নাদুখালা সুযোগ পেয়ে দারোগাকে দু'কথা শুনিয়ে দিলেন। তবে দুপুরে ভরপেট না খাইয়ে ছাড়লেন না।

দারোগা আসার সময় ধলাপাগলাকে নিয়ে এসেছিলো। দশাসই আবেদালির ওপর সুটকো ধলার সে কি রাগ! অবশ্য ওর মার খেয়ে আবেদালির যে কিছুই হয় নি সে কথা বলাই বাহুল্য।

রবিদের হানাবাড়িতে রাতুলরা যে মোহর পেয়েছিলো সেগুলো দারোগাকে ফেরত দিতে হয়েছে। দারোগা দেখেই বললো, ওগুলো নাকি ছ'মাস আগে সরকার বাড়ি থেকে চুরি গেছে।

দারোগার যেতে যেতে বিকেল হয়ে গেলো। এরই মধ্যে খবর এসেছে চৌধুরীদের বাড়ি থেকে রমজান বাদে ধরা পড়েছে চারজন। একজন নাকি পালিয়েছে।

সন্ধেবেলা ছাদে বসে চা খেতে খেতে রাতুল বললো, 'বেনুদা দেখলেন তো, আপনাদের রাজবাড়িটাকে এই ডাকাতরা কিভাবে হানাবাড়ি বানিয়ে রেখেছিলো?'

বেনুদা কিছু বলার আগে গম্ভীর গলায় নবু বললো, 'রাজবাড়িতে ডাকাতদের ঘাঁটি আমিই দেখেছি। সেই সঙ্গে আরো কারো উপস্থিতি টের পেয়েছি। তোমাদের বলেছি সে কথা।'

'তুমি কি বলতে চাও তোমার কানে ফিসফিস করে যারা কথা বলেছে ওরা

জ্বীন ছিলো?' বেপরোয়া ভঙ্গিতে জানতে চাইলো রাতুল।

'হতে পারে জ্বীন। অন্য কিছুও হতে পারে। তবে কিছু—একটা তো বটেই। পুরোনো গোরস্থান আর রাজবাড়িতে চোখে দেখা যায় না এমন কেউ নিশ্চয়ই থাকে। যারা থাকে তারা ভবিষ্যতে কি ঘটবে সেটাও দেখতে পায়। নইলে আমাকে কিভাবে বললো, নৌকায় করে দু'নম্বর ঘাঁটিতে নেবে?'

'নবু, তুমি বলেছো, তখন তুমি তন্দ্রার ঘোরে ছিলে। এমনও তো হতে পারে তখন ওদেরই কেউ বলাবলি করছিলো এ নিয়ে—তোমার কানে এসেছে।'

'তুমি তর্ক করার জন্য এসব বলছো রাতুল। আমি পুরোনো গোরস্থানে থাকতেও ওদের কথা শুনেছি। নৌকার ভেতর যখন আমাকে হাত বেঁধে ছইয়ের নিচে ফেলে রেখেছিলো তখনও শুনেছি। তাছাড়া যেরকম ঝড়ের ভেতর পড়েছিলাম—তোমরা তো বললে কিছুই টের পাও নি।'

রবি বললো, 'আমরা তখন অন্য কিছু টের পেয়েছি। কথা আমিও শুনেছি। এখনো আমার কানে বাজছে—'নবুর ভীষণ বিপদ, তোমরা ঘরে ফিরে যাও। রাতুল সেই কথা না শুনলেও গন্ধটা তো টের পেয়েছিলে?'

দ্বিধাভরা গলায় রাতুল বললো, 'হ্যাঁ, বাজে একটা গন্ধ আমার নাকে লেগেছিলো। কিন্তু এ থেকে কি প্রমাণ হয়?'

এমন সময় একঝলক ঠাণ্ডা ভেজা বাতাস হু হু করে বয়ে গেলো। গায়ে গরম কাপড় থাকা সত্ত্বেও সবার হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠলো। বেনুদা বললো, 'চলো, নিচে গিয়ে বসি। ঝড় আসবে মনে হচ্ছে।'

আগের দিন থেকেই আকাশ মেঘলা ছিলো। সেদিন সন্ধের দিকে ঘন কালো মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেছে। ওরা নিচে নামতেই শুরু হলো ঝড়ের মাতম। আকাশে ঘনঘন বিদ্যুতের ঝলকানি। প্রচণ্ড শব্দে কয়েকটা বাজ পড়লো কাছাকাছি কোথাও। জানালা-দরজা বন্ধ করে ঘরে বসলেও রাতুলরা ঠিকই টের পাচ্ছিলো। বাইরে ঝড়ের কি ভয়ঙ্কর তাণ্ডবলীলা চলছে।

বেনুদা বললো, 'রাতুল, তোমাকে আমি আগেও বলেছি আমি জোর করে কাউকে কিছু বিশ্বাস করতে বলি না। বিজ্ঞান আমিও পড়েছি। আমরা এ গাঁয়ে ছোটবেলা থেকে এমন অনেক কিছু দেখেছি যুক্তি দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যাবে না। সেই মেয়েটার কথাই ধরো না। বলা হয় যাকে জ্বীন নিয়ে গিয়েছিলো। ইমামরা বলেছিলো ওরা দেখেছে আকাশের ভেতর থেকে বিরাট তশতরির মতো নেমে এসেছিলো। আজকাল তো অনেকে ফ্লাইং সসার দেখছে। এমনও তো হতে পারে সেটা একটা ফ্লাইং সসার ছিলো। জ্বীনের কথা বাদ দাও, বিজ্ঞান তো এখন মহশূন্যের গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে মানুষ বা মানুষের চেয়ে উন্নত প্রাণীর অস্তিত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছে। হতে পারে আমাদের এখানে তাদের কেউ রয়েছে। তারা চায় না আমরা তাদের বিরক্ত করি।'

নবু বললো, 'কোরান শরীফে জ্বীনের কথা বলা হয়েছে আগুন দিয়ে বানানো। আগুন মানে যদি এনার্জি হয় তাহলে অনেক জিনিসই আর রহস্যজনক মনে হবে না।'

'কথাটা ওভাবে বলা ঠিক না নবু।' বেনুদা বললো, 'জ্বীনরা এনার্জি হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে, আমরা পারি না। বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরের জন্য বিজ্ঞান এখন কাজ করছে। আমরা যদি শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারি তাহলে অনেক কিছু জানা হয়ে যাবে।'

রাতুল তবু বললো, 'জ্বীনভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করাটা কি খুব জরুরী হয়ে পড়েছে?'

মৃদু হেসে বেনুদা বললো, 'তোমাকে জোর করছে কে? তবে তোমার ভেতর যদি বৈজ্ঞানিক মন থাকে, যে মন জানতে চায়, আবিষ্কার করতে চায়—তাহলে কখনোই কোনো বিশেষ ধারণা আঁকড়ে বসে থেকো না। সবসময় জানার চেষ্টা করো। একশ' বছর আগে মানুষের আকাশে ওড়া বা সমুদ্রের তলায় ঘোরা সায়েন্স ফিকশনের বিষয় ছিলো, এখন তা নয়। এখন ভিন্নগ্রহে উন্নত প্রাণীর অনুসন্ধান বা তাদের পৃথিবীতে আসা সায়েন্স ফিকশনের বিষয়, একশ' বছর পরে সেটা ফিকশন নাও থাকতে পারে।'

রাতুলদের জমজমাট আড্ডার ভেতর নাদুখালা এসে বললেন, 'ঝড় বাড়ছে। অবস্থা সুবিধের মনে হচ্ছে না। তোমরা খেয়ে শুয়ে পড়ো।'

বেনুদাও সায় জানালো—'পৌষের শেষে আমাদের দেশে এরকম ঝড়ের কথা শুনেছো রাতুল?' রাতুল মাথা নাড়লো।

বেনুদা বললো, 'আমাদের এখানে প্রায় প্রতি বছরই এসময়ে ঝড় হয়। শুধু আমাদের গাঁয়ে, আশেপাশের আকাশ শুধু মেঘলা থাকে, ঝড় হয় না।'

খেয়ে উঠে ওরা তিনজন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো। গত দু'রাতের উত্তেজনায় ওরা ভালোমতো ঘুমোতে পারে নি। তাই লেপের তলায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওদের ঘুম এসে গেলো।

মাঝরাতে হঠাৎ বিকট এক শব্দে ওদের ঘুম ভেঙে গেলো। অনেকটা কামান দাগার মতো শব্দ। সারা বাড়ি থর থর করে কেঁপে উঠেছে সেই শব্দে। ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ। বাইরে তখনো ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলছে।

নবু বিছানার ওপর উঠে বসে বললো, 'কিসের শব্দ ওটা?'

রাতুল বললো, 'বাজ পড়েছে বোধ হয়।'

'না, বাজের শব্দ এরকম হয় না।' বলে নবু বিছানা থেকে নামলো।

রবি ভয়ে ভয়ে বললো, 'তোরা কি এখন 'কিসের শব্দ' খুঁজতে বেরুবি?'

রাতুল মৃদু হেসে মাথা নাড়লো—'পাগল নাকি!'

নবু দক্ষিণের জানালার খড়খড়ি তুলে বাইরে তাকালো। ওইটুকু ফাঁক দিয়ে

ঝড়োবাতাস ঘরে ঢুকে সবকিছু এলোমেলো করে দিলো। হঠাৎ নবু চাপা গলায় ডাকলো—'রাতুল, দেখে যাও।'

রাতুল আর রবি ছুটে গেলো জানালার কাছে। নবু ওদের রাজবাড়ির দিকে দেখালো—'ওদিকের আকাশটা দেখো, কি রকম! নিচেও দেখো।'

রাতুল দেখলো চারদিকের আকাশ কালো হলেও দক্ষিণের এক কোণে আকাশ অস্বাভাবিক রকম লাল। জানালা থেকে ঘন গাছপালার জন্য রাজবাড়ি দেখা যায় না। তবে দূরে গাছের ওপর দিয়ে মনে হলো নিচে বোধ হয় কোনো জোরালো আলো জ্বলছে। কালো অন্ধকার ওখানটায় ফিকে হয়ে গেছে।

রাতুল বললো 'বেনুদাকে ডাকবো?'

'না থাক।' নবু মাথা নাড়লো। 'জানাজানি হলে মা আর খালা ধরবে আজান দেয়ার জন্য, রাত জেগে দোয়া-দরুদ পড়ার জন্য—ওসব আমার ভালো লাগে না।'

রাতুল বললো, 'কাল সকালে গিয়ে দেখতে হবে রাজবাড়িতে নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে।'

সকালে যখন ওদের ঘুম ভাঙলো, বাইরে তখন নতুন রুপোর টাকার মতো চকচকে সকাল। ঝলমলে রোদ উঠেছে, আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই। প্রচুর পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। কে বলবে কাল রাতে এতো বড়ো একটা ঝড় হয়ে গেছে।

নাশতা খেতে নেমে শুনলো মাঝরাতে বাজ পড়ার শব্দ সবাই শুনেছে। ওরা আর কাউকে আলো দেখার কথা বললো না।

পরদিন বাড়িতে জেয়াফত হবে। বেনুদা লঞ্চঘাটে গেছেন কাকাদের আনার জন্য। বাড়িতে মহা হৈচৈ। ওরা তিনজন কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লো।

আমবাগানের ভেতর দিয়ে পুরোনো গোরস্থানে ঢুকে ওরা অবাক হয়ে গেলো। রাজবাড়ির আশেপাশে অনেকগুলো তালগাছ ছিলো। সবগুলো গাছের মাথা পুড়ে গেছে। কালো থামের মতো ন্যাড়া তালগাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে শুধু।

কাছে গিয়ে আরো অবাক হলো। কাঁটাঝোপের চিহ্নমাত্র নেই। পুড়ে সব ছাই হয়ে বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে গেছে। ওদের জন্য সবচেয়ে বড়ো বিস্ময় অপেক্ষা করছিলো আরো সামনে।

একদিন আগেও যেখানে পুরোনো রাজবাড়ির বিশাল ধ্বংসস্তুপ ছিলো, সেখানে এক টুকরো ইটের কণাও নেই। গোটা জায়গা জুড়ে বিরাট এক পুকুর। ঘোলাটে পানিতে ভরে আছে কানায় কানায়। চারপাশে অস্বাভাবিক নীরবতা।

ওরা তিনজন কোনো কথাই বলতে পারলো না—শুধু একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। তারপর সম্মোহিতের মতো এগিয়ে গেলো পুকুরের দিকে।

নবু পুকুরের পাড়ে বসে পানিতে হাত ডুবিয়ে ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো চমকে উঠে সরে এলো। হাতটা নাকের কাছে এনে শুঁকলো। বিচ্ছিরি একটা গন্ধ।

রাতুল কাছে এসে বললো, 'কি হয়েছে নবু?'

নবু হতভম্ব হয়ে বললো, 'ভীষণ গরম পানি। আর এই গন্ধটা দেখ, কি বাজে!'

রাতুল নবুর হাত শুঁকে রবির দিকে তাকালো-'কি আশ্চর্য, সেদিন পুরোনো গোরস্থানে যে গন্ধটা পেয়েছিলাম, ঠিক সেই গন্ধ।'

ওরা টেরও পেলো না— চারপাশ থেকে ঘন কুয়াশার দেয়াল কখন এসে ওদের ঘিরে ফেলেছে।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan